www.bari.gov.bd

উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি

২০১৭-১৮

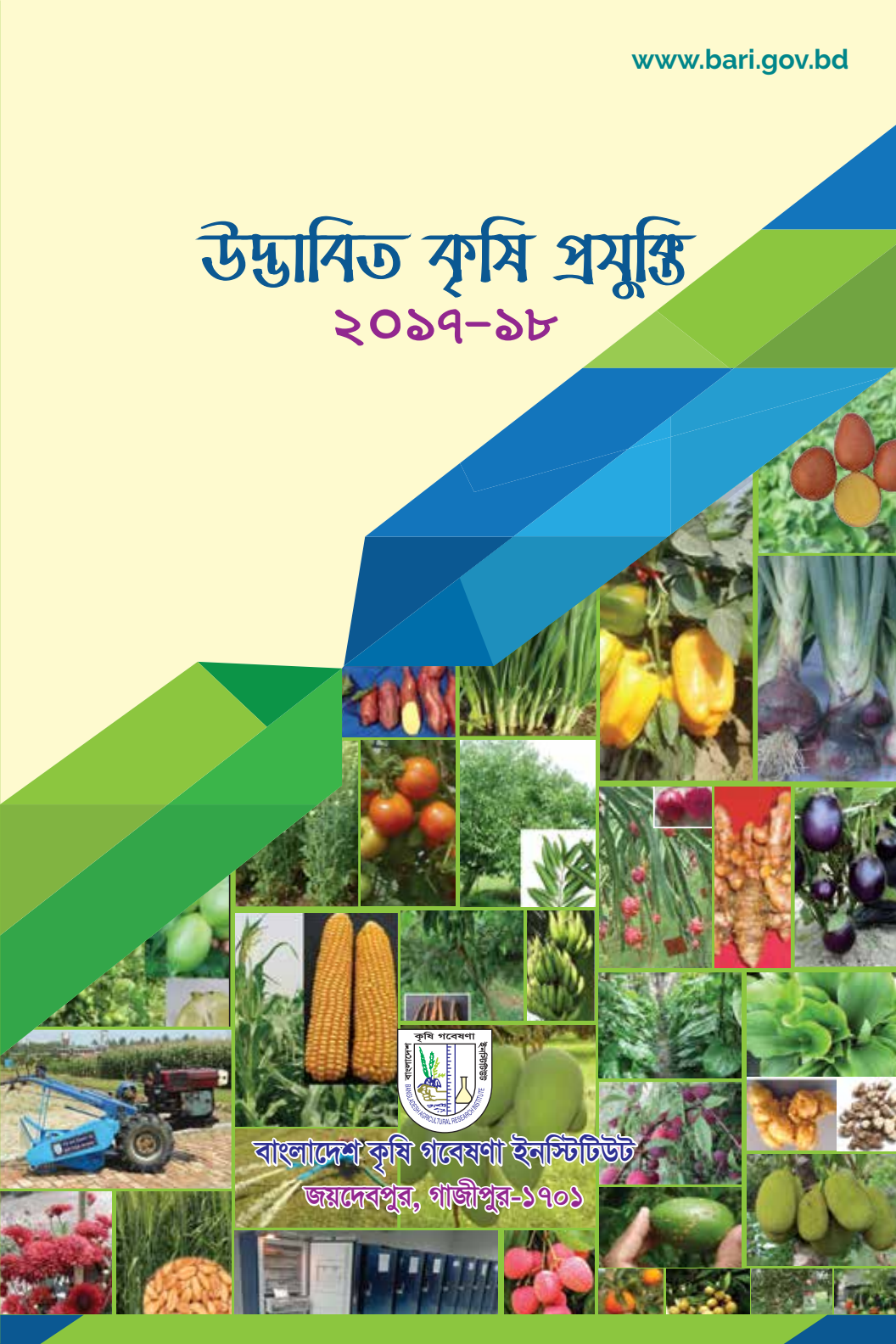

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি
২০১৭-১৮

সংকলন ও সম্পাদনায়

ড. আবুল কালাম আযাদ
মো. শোয়েব হাসান
ড. মো. সাখাওয়াৎ হোসেন
ড. মো. লুৎফর রহমান
ড. সৈয়দ নূরুল আলম
ড. মো. আব্দুল ওহাব
ড. দিলোয়ার আহমদ চৌধুরী
ড. মো. ওমর আলী
মো. হাসান হাফিজুর রহমান
মো. আল-আমিন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০১৮
২,০০০ কপি

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

স্বত্ব সংরক্ষিত
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুদ্রণে
বেঙ্গল কম-প্রিন্ট
৬৮/৫, গ্রীণরোড, পান্থপথ
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
মোবাইল ঃ ০১৭১৩০০৯৩৬৫

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিবছর গবেষণাধীন ফসলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উন্নত জাত, উৎপাদন পদ্ধতি, মৃত্তিকা ও সেচ ব্যবস্থাপনা, রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, উন্নত ফসল বিন্যাস, কৃষি যন্ত্রপাতিসহ নানা রকমের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে থাকে যা সচিত্র সন্নিবেশ করে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়। এ ধরনের পুস্তিকা প্রকাশের মূল লক্ষ্য হলো যাদের জন্য এসব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে তাদের নিকট তা যথাসময়ে পৌঁছে দেয়া। এছাড়া, এসব মূল্যবান তথ্য সংকলন করে তা সংরক্ষণ করাও অন্যতম উদ্দেশ্য। অত্র ইনস্টিটিউট হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে গমের ১টি, (বারি গম-৩৩), হাইব্রিড ভুট্টার ১টি (বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৬), বার্লির ১টি (বারি বার্লি-৮), আলুর ২টি (বারি আলু-৭৮, বারি আলু-৭৯), মিষ্টি আলুর ২টি (বারি মিষ্টি আলু-১৪, বারি মিষ্টি আলু-১৫), ওলকচুর ২টি (বারি ওলকচু-১, বারি ওলকচু-২), সরিষার ১টি (বারি সরিষা-১৮), খেসারীর ১টি (বারি খেসারী-৫), মসুরের ১টি (বারি মসুর-৯), শিমের ২টি (বারি শিম-৯, বারি শিম-১০), লেবুর ২টি (বারি লেবু-৪, বারি কাগজী লেবু-১), মাল্টার ১টি (বারি মাল্টা-২), দারুচিনির ১টি (বারি দারুচিনি-১), তেজপাতার ১টি (বারি তেজপাতা-১), একাঙ্গির ১টি (বারি একাঙ্গি-১), চিভ এর ১টি (বারি চিভ-১), পানের ১টি (বারি পান-৩)

সহ মোট ২২ (বাইশ) টি উন্নত উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। এছাড়া, উন্নত ফসল বিন্যাস, সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা, উন্নত সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৩২ (বত্রিশ) টি লাগসই প্রযুক্তি এই পুস্তিকায় স্থান পেয়েছে।

আমি আশা করি, পুস্তিকাটি প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রমে ম্যানুয়াল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ প্রয়োগ করে আমাদের দেশের কৃষকেরা তাদের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন এবং আর্থিকভাবে লাভবান হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। ছাত্র-শিক্ষক, সম্প্রসারণবিদ এবং কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্মীরা পুস্তিকাটি দ্বারা উপকৃত হবেন। পুস্তিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হোক এই কামনা করছি। প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সঙ্গে জড়িত বিজ্ঞানীদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। পুস্তিকাটির সংকলন ও সম্পাদনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

(ড. আবুল কালাম আযাদ)

বিষয় সূচি

গমের জাত

বারি গম-৩৩ ..... ৯
উৎপাদন প্রযুক্তি ১০

ভুট্টার জাত

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৬ ..... ১২
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৩

বার্লির জাত

বারি বার্লি-৮ ..... ১৬
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৬

সরিষার জাত

বারি সরিষা-১৮ ..... ১৯
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৯

আলুর জাত

বারি আলু-৭৮ ..... ২১
বারি আলু-৭৯ ..... ২২
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৩

মিষ্টি আলুর জাত

বারি মিষ্টি আলু-১৪ ..... ২৮
বারি মিষ্টি আলু-১৫ ..... ২৮
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৯

ওলকচুর জাত

বারি ওলকচু-১ ..... ৩১
বারি ওলকচু-২ ..... ৩১
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩২

মসুরের জাত
বারি মসুর-৯ ..... ৩৪
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৫

খেসারীর জাত
বারি খেসারী-৫ ..... ৩৮
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৯

শিমের জাত
বারি শিম-৯ (খাইস্যা) ৪১
বারি শিম-১০ (খাইস্যা) ৪২
উৎপাদন প্রযুক্তি ৪৩

লেবুর জাত
বারি কাগজী লেবু-১ ..... ৪৫
উৎপাদন প্রযুক্তি ৪৬
বারি লেবু-৪ ..... ৪৯
উৎপাদন প্রযুক্তি ৪৯

মাল্টার জাত
বারি মাল্টা-২ ..... ৫২
উৎপাদন প্রযুক্তি ৫২

দারুচিনির জাত
বারি দারুচিনি-১ ..... ৫৫
উৎপাদন প্রযুক্তি ৫৫

তেজপাতার জাত
বারি তেজপাতা-১ ..... ৫৭
উৎপাদন প্রযুক্তি ৫৭

পানের জাত
বারি পান-৩ ..... ৬০
উৎপাদন প্রযুক্তি ৬১

একাঙ্গীর জাত

বারি একাঙ্গী-১ ..... ৬৬
উৎপাদন প্রযুক্তি ৬৬

চিভ এর জাত

বারি চিভ-১ ..... ৬৯
উৎপাদন প্রযুক্তি ৬৯

বারি উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি

জিরার অল্টারনারিয়া ব্লাইট রোগ দমন প্রযুক্তি ৭১
মেথীর মূল ও গোড়া পচা রোগ দমন প্রযুক্তি ৭২
বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে বাঁধাকপি উৎপাদন ৭৩
বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে করলা উৎপাদন ৭৬
হালকা বুনটের মাটির জন্য লাভজনক ফসল-ধারা: আগাম আলু-গম-মুগডাল-আমন ধান ৮০
গম-ভুট্টা-আমনধান ফসলধারায় স্বল্পচাষ ও মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপবৃদ্ধি ৮১
ফলজ ও বনজ বৃক্ষের জায়ান্ট মিলিবাগ দমন ব্যবস্থাপনা ৮২
আমের ফুল ও ফল ঝরা রোধে টেকসই ব্যবস্থাপনা ৮৪
সবজি থেকে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ সংক্রমণমুক্তকরণ ৮৬
আকর্ষণ ও মেরে ফেলা পদ্ধতির মাধ্যমে কুমড়া জাতীয় ফসলের মাছি পোকা দমন ৮৮
জৈব বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিমের প্রধান ক্ষতিকর পোকা (মাজরা ও জাব পোকা) দমন ৮৯
বেগুনের বিভিন্ন ধরনের শোষক পোকার সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা ৯০
কাকরোল, টমেটো ও শসা থেকে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ দূরীকরণ ৯১
ফুলকপির বীজ উৎপাদনে মলিবডেনামের ব্যাবহার ৯২
বেগুনের শিকড়ের গিঁট রোগ দমন ব্যবস্থাপনা ৯৩
টমেটো উৎপাদনে ভার্মিকম্পোস্ট ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহার ৯৪

মটরশুঁটি উৎপাদনে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার, ভার্মিকম্পোস্ট ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহার ৯৫

ঝাড়শিম উৎপাদনে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার, ভার্মিকম্পোস্ট ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহার ৯৬

উঁচু বেড পদ্ধতি ও পটাশিয়াম ব্যবহারের মাধ্যমে লবণাক্ত মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও ভুট্টা উৎপাদন ৯৭

পিঁয়াজ, কাঁচামরিচ এবং শুকনা মরিচের গুঁড়ার মাধ্যমে কাঠবিড়ালী দমন ৯৯

সমন্বিত আগাছা দমনের মাধ্যমে মুগডালের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ১০০

উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে স্বাদু ও লবণাক্ত পানির সংযোজক সেচ প্রয়োগে ফসল উৎপাদন ১০১

মসুরের স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট (পাতা ঝলসানো) রোগ দমন ব্যবস্থাপনা ১০২

সংরক্ষণ কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে ধানী জমিতে মসুর চাষ ১০৩

সেডনেটে জারবেরা পাতায় GA_3 প্রয়োগের মাধ্যমে ফুলের গুণগত মান ও সংখ্যা বৃদ্ধি ১০৪

বাঁধাকপি ও ফুলকপি ফসলের সাধারণ কাটুই পোকার সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ১০৫

মরিচের ফলছিদ্রকারী পোকা এর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ১০৬

কচু ফসলের সাধারণ কাটুই পোকা (প্রোডেনিয়া ক্যাটাপিলার) এর সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা ১০৭

আকর্ষণ ও মেরে ফেলা পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন ফল যেমন আম, পেয়ারা, কমলা ও কুলের মাছি পোকা দমন ১০৮

কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা এর সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা ১০৯

হালকা বুনটের মাটির জন্য অধিক লাভজনক ফসল-ধারা: আগাম আলু-গম-ভুট্টা-আমনধান ১১০

টমেটো ও বেগুনের ড্যাম্পিং অফ বা চারা গাছ ঢলে পড়া রোগ দমনে কৃষকদের করণীয় ১১১

গমের জাত

বারি গম-৩৩

বারি গম-৩৩

বারি গম ৩৩ একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। KACHU এবং SOLALA জাতের মধ্যে সিমিটে সংকরায়নকৃত এজাতটি হারভেস্ট প্লাস ট্রায়ালের মাধ্যমে ২০১৩ সালে এদেশে নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিএডব্লিউ ১২৬০ নামে কৌলিক সারিটি প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন নার্সারি ও ফলন পরীক্ষায়ও এ কৌলিক সারিটি ভাল বলে প্রমাণিত হয়। জাতটি ২০১৬ ও ২০১৭ সালের ল্যাবরেটরি ও মাঠ পরীক্ষায় ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এ কৌলিক সারিটি ২০১৭ সালে বারি গম ৩৩ হিসেবে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্যঃ

বারি গম ৩৩ এর প্রজনন বীজ উৎপাদন প্লট

- তিন থেকে পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট ও গাছের উচ্চতা ১০০-১০৫ সেমি।
- পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ।
- জীবনকাল ১১০-১১৫ দিন
- শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪২-৪৭টি।
- দানা সাদা, চকচকে ও হাজার দানার ওজন ৪৫-৫২ গ্রাম
- জাতটি গমের ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী ও জিংক সমৃদ্ধ
- দানায় জিংকের মাত্রা ৫০-৫৫ পিপিএম
- জাতটির কাণ্ড শক্ত ও গাছ সহজে হেলে পড়ে না
- জাতটি তাপ সহিষ্ণু
- উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ফলন ৪.০-৫.০ টন।

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

চারা অবস্থায় কুশিগুলো কিছুটা হেলানো থাকে। গাছের রং গাঢ় সবুজ। উপরের কাণ্ডের গিঁড়ায় মাঝারী সংখ্যক রোম থাকে। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো। শীষে ও কাণ্ডে মাঝারীভাবে এবং নিশান পাতার খোলে ঘনভাবে মোমের মত আবরন (Glaucosity) থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় মাঝারী ও আকারে খাঁজ কাটা (Elevated), ঠোঁট লম্বা (>১২.০ মিলিমিটার) এবং ঠোঁটে অনেক কাঁটা থাকে। ফেনোল টেস্টে দানা গাঢ় রং (Dark) ধারণ করে।

উপযোগিতা

জাতটি ব্লাস্ট প্রতিরোধী হওয়ায় দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ব্লাস্টপ্রবণ এলাকায় চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বপনের সময়: নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ণ মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) গম বপনের উপযুক্ত সময়। তবে তাপসহনশীল জাত ডিসেম্বর মাসে ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশি ফলন দেয়।

বীজের পরিমাণ: গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশি হলে হেক্টরপ্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে।

বীজ শোধন: প্রোভেক্স-২০০ নামক ছত্রাক নাশক (প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম হারে) মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। বীজ শোধন করলে বীজ বাহিত রোগ দমন হয় এবং বীজ গজানোর ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ চারা সবল ও সতেজ হয়। বীজ শোধন করলে ফলন শতকরা ১০-১২ ভাগ বৃদ্ধি পাবে।

বপন পদ্ধতি: সারিতে অথবা ছিটিয়ে গম বীজ বপন করা যায়। সারিতে বপনের জন্য জমি তৈরির পর ছোট লাঙ্গল বা বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে ২০ সে. মি. বা ৮ ইঞ্চি দূরে দূরে সারিতে এবং ৪-৫ সে. মি. গভীরে বীজ বুনতে হবে। ধান কাটার পর পরেই পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে স্বল্পতম সময়ে গম বোনা যায়। এ যন্ত্রের সাহায্যে একসঙ্গে জমি চাষ, সারিতে বীজ বপন ও মইয়ের কাজ করা যাবে।

সার প্রয়োগ: জমি চাষের শুরুতে হেক্টরপ্রতি ৭.৫-১০ টন গোবর/কম্পোস্ট জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা উত্তম। জৈব সার প্রয়োগ করার পর সেচসহ চাষের ক্ষেত্রে হেক্টরপ্রতি ১৫০-১৭৫ কেজি ইউরিয়া, ১৩৫-১৫০ কেজি টিএসপি,

১০০-১১০ কেজি পটাশ ও ১১০-১২৫ কেজি জিপসাম সার শেষ চাষের পূর্বে জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে চাষ ও মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

সেচসহ চাষের ক্ষেত্রে চারার তিন পাতা বয়সে প্রথম সেচের পর দুপুর বেলা মাটি ভেজা থাকা অবস্থায় প্রতি হেক্টরে ৭৫-৯০ কেজি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, সেচ ছাড়া চাষের ক্ষেত্রে সমস্ত ইউরিয়া শেষ চাষের সময় অন্যান্য রাসায়নিক সারের সাথে প্রয়োগ করতে হবে। তবে সেচ ছাড়া চাষের ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত হলে বৃষ্টির পর জমি ভেজা থাকা অবস্থায় উপরি প্রয়োগের জন্য নির্ধারিত ইউরিয়া প্রয়োগ করা ভালো। জমিতে প্রায়শ বোরন সারের ঘাটতি দেখা যায় বলে প্রতি হেক্টরে ৬.৫ কেজি হারে বরিক এসিড শেষ চাষের সময় অন্যান্য রাসায়নিক সারের সাথে প্রয়োগ করতে হবে। যেসব জমিতে দস্তা সারের ঘাটতি রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ফসলে দস্তা প্রয়োগ করা হয়নি সে সব জমিতে শেষ চাষের সময় হেক্টরপ্রতি ১২.৫ কেজি দস্তা সার যথা জিংক সালফেট (মনোহাইড্রেট শতকরা ৩৬ ভাগ জিংক সম্বলিত) শেষ চাষের সময় অন্যান্য রাসায়নিক সারের সাথে প্রয়োগ করা ভালো।

জমিতে অম্লীয় মাত্রা ৫.৫ এর নিচে হলে হেক্টরপ্রতি ১০০০ কেজি হারে ডলোচুন গম বপনের কমপক্ষে দু'সপ্তাহ আগে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি ৩ বছরে একবার ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগঃ মাটির প্রকারভেদে গম আবাদে ২-৩টি সেচের প্রয়োজন হয়। প্রথম সেচ চারার তিন পাতার সময় (বপনের ১৭-২১ দিন পর), দ্বিতীয় সেচ শীষ বের হওয়ার সময় (বপনের ৫০-৫৫ দিন পর) এবং তৃতীয় সেচ দানা গঠনের সময় (বপনের ৭৫-৮০ দিন পর) দিতে হবে। তবে মাটির প্রকারভেদে ও শুষ্ক আবহাওয়ায় ভাল ফলনের জন্য অতিরিক্ত এক বা একাধিক সেচ দেয়া ভাল। প্রথম সেচটি খুবই হালকাভাবে দিতে হবে। তা না হলে অতিরিক্ত পানিতে চারার পাতা হলুদ এবং চারা সম্পূর্ণ বা আংশিক নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেচের পর পরই জমি থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে হবে। তাই বপনের পর জমির ঢাল বুঝে ২০-২৫ ফুট অন্তর নালা কেটে রাখতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যাঃ বীজ বপনের পর ১০-১২ দিন পর্যন্ত পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে বীজ বা চারার সংখ্যা সঠিক থাকে। বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে জমিতে 'জো' অবস্থায় আগাছা দমনের জন্য নিড়ানী দিতে হবে। নিড়ানীর ফলে মাটি আলগা হবে এবং আর্দ্রতা বজায় থাকবে। চওড়া পাতা জাতীয় আগাছা (বথুয়া ও কাকরি) দমনের জন্য ২,৪ ডি এমাইন বা এফিনিটি জাতীয় আগাছা দমনকারী ঔষধ প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৩৫ মিলিলিটার হিসেবে ভালভাবে মিশিয়ে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে মেঘমুক্ত দিনে একবার প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া

যাবে। সময়মত আগাছা দমন করলে ফলন শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ক্ষেতে ইঁদুরের আক্রমণ শুরু হলে ফাঁদ পেতে বা বিষটোপ (জিঙ্ক ফসফাইড বা ল্যানিরেট) দিয়ে দমন করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: গম গাছ সম্পূর্ণরূপে পেকে হলুদ বর্ণ ধারণ করলে কাটার উপযুক্ত সময় হিসেবে গণ্য হবে। গম পাকার পর বেশি দিন ক্ষেতে থাকলে ঝড়/শিলা বৃষ্টিতে যথেষ্ট ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রৌদ্রজ্জ্বল দিনে সকালের দিকে গম কেটে দুপুরে মাড়াই করা উত্তম। মড়াই যন্ত্রের সাহায্যে সহজে গম মাড়াই করা যায়।

বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: বীজের বিশুদ্ধতা নিশ্চিতকরণের জন্য শীষ বের হওয়ার পর হতে পাকা পর্যন্ত কয়েকবার অন্য জাতের মিশ্রণ, রোগাক্রান্ত গাছ এবং আগাছা গোড়াসহ উঠিয়ে ফেলতে হবে। বীজ সংগ্রহের জন্য গম পাকার পর হলুদ হওয়া মাত্রই কেটে রৌদ্রে শুকিয়ে আলাদা করে মাড়াই করতে হবে এবং মাড়াইয়ের পর কয়েক দিন বীজ শুকানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বীজের আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগ বা তার নিচে রাখতে হবে। দানা দাঁতের নিচে চাপ দিলে কট করে শব্দ হলে বুঝতে হবে যে, উক্ত বীজ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত। সংরক্ষণের পূর্বে পুষ্ট বীজ চালানি দিয়ে চেলে বাছাই করে নিতে হবে।

ভুট্টার জাত

বারি হাইব্রিড ভুট্টা -১৬

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৬

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

- জাতটি সহজে হেলে ও ভেঙ্গে পড়ে না।
- জাতটি মাঝারী উচ্চতাসম্পন্ন (১৮৬ সেমি) এবং মোচার উচ্চতা (৮৪ সেমি)।

- জাতটি মধ্যমমাত্রায় লবণাক্ততা (৮-৯ ডিএস/মি.) সহনশীল।
- মোচাগুলো সম্পূর্ণভাবে অগ্রভাগ পর্যন্ত খোসাদ্বারা মজবুতভাবে আবৃত থাকে এবং সকল মোচা গাছের একই উচ্চতায় অবস্থিত।
- রবি মৌসুমে গাছে ৮৮ দিনে সিল্ক বের হয়, সিল্কের রং কিছুটা বেগুনী।
- দানা হলুদ, সেমি-ডেন্ট প্রকৃতির, পুষ্ট ও বড় এবং সম্পূর্ণ মোচা দানা দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে।
- মোচা পরিপক্ক অবস্থায়ও গাছ ও পাতাসমূহ সবুজ থাকে (Stay Green)।
- দানা বড় আকারের এবং হাজার দানার ওজন ৪২২ গ্রাম এবং প্রতি মোচায় গড়ে ৬৩২ টি দানা থাকে।
- জাতটি রবি মৌসুমে পরিপক্ক হতে ১৪০-১৪৫ দিন সময় লাগে।
- জাতটি পাতা ঝলসানো রোগ সহনশীল।

উপযোগী এলাকা: সমগ্র বাংলাদেশই জাতটি আবাদের উপযোগী।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বপনের সময়: রবি মৌসুমে উপযুক্ত বপন সময় কার্তিকের শুরু থেকে অগ্রহায়ণের ৩য় সপ্তাহ (মধ্য অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ)। বীজ বপনে দেরি হলে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের শেষ বা তার পরে বীজ বপন করলে ফলন কমে যায়।

বীজ হার: ২০-২২ কেজি/হেক্টর

বপন দূরত্ব: ২৫ সেমি. (বীজ -বীজ) এবং ৬০ সে.মি. (সারি-সারি)

মাড়াইয়ের সময়: মোচা খড়ের রং ধারণ করলে ও পাতা কিছুটা হলদে হয়ে এলে বুঝতে হবে মোচা সংগ্রহের সময় হয়েছে। এ অবস্থায় মোচা থেকে ছাড়ানো দানার গোড়ায় কালো দাগ দেখা দিলে মোচাগুলো গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। রবি মৌসুমে উপযুক্ত সময়ে বপন করা হলে মধ্য ফাল্গুন থেকে মধ্য বৈশাখ পর্যন্ত (মার্চের ১ম সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের ৩য় সপ্তাহ)।

ফলন: জাতটির ফলন রবি মৌসুমে ১১.৫৭ টন/ হেক্টর এবং লবণাক্ত (৯ ডিএস/মি) এলাকায় ৭.০৬ টন/ হেক্টর ফলন দিতে সক্ষম।

রোগ বালাই: ভুট্টার উল্লেখ্যযোগ্য রোগের মধ্যে লিফ ব্লাইট বা পাতা ঝলসানো, শীষ ব্লাইট বা পাতার খোল ঝলসানো এবং লিফ স্পট বা পাতার দাগ রোগ বাংলাদেশে কম বেশি লক্ষ্য করা যায়।

পাতা ঝলসানো রোগে আক্রান্ত ভুট্টা গাছ

পাতার দাগ রোগে আক্রান্ত ভুট্টা গাছ

রোগবালাই দমন ব্যবস্থা: টিল্ট ২৫০ ইসি ছত্রাকনাশক অথবা ফলিকিউর প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মি.লি. হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ৪ বার গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করলে পাতা ঝলসানো, শীষ বাইট বা পাতার খোল ঝলসানো এবং পাতার দাগ রোগ দমন করা যায়।

পোকামাকড়: মাঠ পর্যায়ে বেশ কিছু কীটপতঙ্গ ভুট্টা ফসলকে আক্রমণ করে। এর মধ্যে কাটুই পোকা, ডগা ছিদ্রকারী পোকা, পাতা খেকো লেদা পোকা ও জাব পোকা অন্যতম।

কাটুই পোকা আক্রান্ত গাছ

পাতা খেকো লেদাপোকা আক্রান্ত গাছ

জাব পোকা আক্রান্ত গাছ

ডগা ও কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা

পোকামাকড় দমন ব্যবস্থা: কাটুই পোকা দমনের জন্য ভোর বেলা কাটা চারা গাছের গোড়া খুঁড়ে কীড়াগুলো মেরে ফেলতে হবে। তাছাড়া হালকা সেচ দিলে মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা কীড়া মাটির উপরে আসবে, ফলে সহজে পাখি এদের ধরে খাবে বা হাত দ্বারা মেরে ফেলা যাবে। এছাড়া প্রতি লিটার পানির সাথে ৫ মি.লি. কীটনাশক (ডার্সবান ২০ ইসি বা পাইরিফস ২০ ইসি) মিশিয়ে গাছের গোড়ায় চার দিকে বিকাল বেলায় ভালভাবে স্প্রে করে দিতে হয়। আবার পাতা খেকো লেদা পোকা দ্বারা আক্রান্ত গাছে প্রতি লিটার পানির সাথে ১ গ্রাম কীটনাশক (প্রোরোক্লেইন ৫ এসজি বা ইমাকর ৫ এসজি) মিশিয়ে গাছের উপরিভাগ ভালভাবে স্প্রে করে

ভিজিয়ে দিতে হবে। জাব পোকা দমনের জন্য প্রতি লিটার পানির সাথে ৫ গ্রাম ডিটারজেন্ট বা সাবানের গুঁড়া মিশ্রিত করে আক্রান্ত গাছে প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া প্রতি লিটার পানির সাথে বায়োনিম ১ ইসি বা ফাইটোম্যাক্স ৩ ইসি (১ মি.লি.) অথবা মেলাডান ৫৭ ইসি (২ মি.লি.) হারে ভালভাবে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে স্প্রে করে জাব পোকা দমন করা যায়। ডগা ও কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা দমনের জন্য ফুরাডান ৫ জি প্রতি হেক্টরে ২০ কেজি হারে অথবা ৩/৪ টি দানা প্রতি গাছের উপরিভাগে এমন ভাবে প্রয়োগ করতে হয় যেন দানাগুলো কাণ্ড এবং পাতার মাঝে থাকে। চারা অবস্থায় ফেরোমন ফাঁদ ১০ বর্গ মিটার দূরত্বে স্থাপন করে এ পোকা দমন করা যায়। আক্রান্ত মাঠ বায়ো কীটনাশক যেমন স্পিনোসেড প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪ মি.লি. হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া প্রতি লিটার পানিতে ২ মি.লি. মার্শাল ২০ ইসি অথবা ডায়াজিনন ৬০ ইসি ভালোভাবে মিশিয়ে স্প্রে করলে এই পোকা দমন করা যায়।

সার ব্যবস্থাপনা

জমির প্রকারভেদে সারের মাত্রা বিভিন্ন হয়। রবি মৌসুমে নিম্নোক্ত হারে সার প্রয়োগ করলে ভাল ফলন আশা করা যায়।

সারের নাম	হেক্টর প্রতি (কেজি)	একর প্রতি (কেজি)
ইউরিয়া	৫৩০-৫৮০	২১৫-২৩৫
টিএসপি	২৬০-৩০০	১০৫-১২০
এমপি	১৮৫-২৩৫	৭৫-৯৫
জিপসাম	২১০-২৩৫	৮৫-৯৫
জিংক সালফেট	১২-১৫	৫-৬
বরিক এসিড	৫-৮	২-৩
গোবর/আর্বজনা পচা সার	৪৪৫০-৫০০০	১৮০০-২০০০

জমি তৈরির শেষ চাষে ইউরিয়ার অর্ধেক অংশ এবং অন্যান্য সার জমিতে ছিটিয়ে চাষ ও মই দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট অর্ধেক ইউরিয়া সার বীজ গজানোর ৬০-৬৫ দিন পর (গাছের মাথায় পুরুষ ফুল বের হওয়ার আগে) উপরি প্রয়োগ করে সেচ প্রয়োগ করতে হয়। সার উপরি প্রয়োগের সময় জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ রস থাকা আবশ্যক। উপরি প্রয়োগের সময় সার ছিটিয়ে না দিয়ে সারিতে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করা ভাল। গোবর সার প্রয়োগ করলে ইউরিয়া সারের মাত্রা কম দিতে হবে।

বার্লির জাত

বারি বার্লি-৮

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য: গাছের গড় উচ্চতা ৭৩ সে.মি. । শীষ ১০.৭ সে.মি. লম্বা হয়। প্রতি শীষে গড়ে ৫৮ টি করে দানা থাকে । শীষ ৬ সারি বিশিষ্ট এবং দানা খোসামুক্ত (Hull-less)। হাজার দানার ওজন ৩৪-৩৮ গ্রাম। জাতটি রবি মৌসুমে ৯৫ দিনে পরিপক্ক হয়। এ জাতটি লবণাক্ততা সহনশীল (৪.৮-১০.০ ডিএস/মি)।

বারি বার্লি-৮ ও খোসামুক্ত দানা

উপযোগী এলাকা: নিষ্কাশিত বেলে দো-আঁশ বা দো-আঁশ মাটি বার্লি আবাদের জন্য উপযুক্ত। প্রতিকূল প্রান্তিক জমি যেমন লবণাক্ত এলাকায় (নোয়াখালী, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা ও খুলনা) এই জাতটি বিশেষভাবে চাষ উপযোগী ।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বপনের সময়: রবি মৌসুমের কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে অগ্রহায়ণের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত (নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত) বীজ বপন করা যায়। দেরিতে বীজ বপনে ফলন কমে যায়।

বীজ হার: সারিতে বপনকৃত জমিতে হেক্টরপ্রতি ১০০ কেজি বীজ বপন করতে হবে। ছিটিয়ে বপন করলে প্রতি হেক্টরে ১২০ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়।

বপন দূরত্ব: সারিতে বপন করলে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫-৩০ সে.মি. এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০ সে.মি. হওয়া উত্তম। মাটিতে 'জো' থাকা অবস্থায় লাঙ্গল দিয়ে ২.৫-৩.৫ সে.মি. গভীর নালা টেনে তাতে বীজ বুনে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

মাড়াইয়ের সময়: বার্লির শীষ খড়ের রং ধারণ করলেও পাতা কিছুটা বাদামী রং ধারণ করলে ফসল সংগ্রহ করতে হবে। রৌদ্র উজ্জ্বল দিনে সকালের দিকে বার্লি কাটা উত্তম।

ফলন: লবণাক্ত এলাকায় জাতটির ফলন ২.২০-২.৫১ টন/ হেক্টর হয়।

রোগবালাই: বার্লিতে রোগের প্রকোপ তুলনামূলকভাবে কম। তবে মাঝে মধ্যে চারা অবস্থায় গোড়াপচা রোগ বার্লির ক্ষেতে বেশ ক্ষতি সাধন করে থাকে। এছাড়াও বার্লিতে পাতার দাগ রোগ হয়ে থাকে।

বার্লির গোড়া পচা রোগ

বার্লির পাতার দাগ রোগ

রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা

গোড়াপচা রোগ দমনের উপায়: জমিতে বীজ বোনার সময় যাতে মাটিতে অতিরিক্ত আর্দ্রতা না থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে। পূর্ববর্তী ফসলের পরিত্যক্ত অংশ জমি থেকে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। বপনের পূর্বে প্রোভেক্স ২০০ নামক ছত্রাক নিবারক দিয়ে প্রতি কেজি বীজ ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে শোধন করতে হবে।

পাতার দাগ রোগ দমনের উপায়: বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম হারে প্রোভেক্স ২০০ নামক ছত্রাক নিবারক মিশিয়ে বীজ শোধন করা। তাছাড়া জমিতে রোগের আক্রমণ দেখা যাওয়ার সাথে সাথে টিল্ট-২৫০ ইসি অথবা নোইন ৫০ ডবিউপি (কার্বেন্ডাজিম ৫০%) নামক ছত্রাক নিবারক ১৫ দিন অন্তর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে। ফসল সংগ্রহের পর ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলা উচিত।

পোকামাকড়: বার্লিতে তেমন কোন পোকা-মাকড়ের আক্রমণ দেখা যায় না । তবে মাঝে মধ্যে চারা অবস্থায় বার্লির ক্ষেতে "তার পোকা" দেখা যায়। গাছের বয়স যখন ২৫-৩৫ দিন হয় তখন তার পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয় ফলে Dead heart লক্ষণ দেখা দেয়। এ ধরনের আক্রান্ত গাছ উঠালে দেখা যাবে গাছের গোড়ার অংশ থেতলিয়ে গেছে। এছাড়াও চারা অবস্থায় কাটুই পোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে।

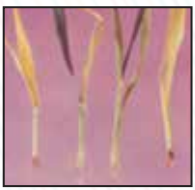

তার পোকা ও আক্রান্ত বার্লির চারা

কাটুই পোকা ও আক্রান্ত বার্লির চারা

পোকামাকড় দমন ব্যবস্থা: তার পোকা আক্রান্ত ডগা সংগ্রহ করে কীড়াসহ ধ্বংস করতে হবে। তাছাড়া যে সমস্ত এলাকায় এ পোকার আক্রমণ বেশি হয় সেখানে

হেক্টরপ্রতি ১৮ কেজি কার্বোফুরান (ফুরাডান ৫ জি) বীজ বপনের সময় মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণত বেলে ও বেলে দোআঁশ জমিতে তার পোকার আক্রমণ বেশি হয়। সময় ও স্থান ভেদে এ পোকার দ্বারা ৭.৫% পর্যন্ত চারা গাছ আক্রান্ত হতে পারে। ফসল তোলার পর আক্রান্ত জমি ভালভাবে চাষ করলে এ পোকার বংশ বৃদ্ধি কমে যায়।

কাটুই পোকা দমনের জন্য দিনের বেলা আক্রান্ত গাছের গোড়া থেকে মাটি সরিয়ে পোকা বের করে মেরে ফেলতে হবে। হালকা সেচ দিলে মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা কীড়া মাটির উপরে আসবে, ফলে পাখি সহজে এদের ধরে খাবে বা হাত দ্বারা এদের মেরে ফেলা যাবে। এছাড়া বিষ ফাঁদ ব্যবহার করে এ পোকা দমন করা যায়। বিষ ফাঁদ তৈরি করার জন্য প্রতি হেক্টরে ২ কেজি সেভিন ৮৫ ডাবিউপি এর সাথে ১০০ কেজি গম বা ধানের কুড়া মিশ্রিত করে সন্ধ্যার সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া প্রতি লিটার পানির সাথে ৫ মিলি ডার্সবান ২০ ইসি বা পাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে গাছের গোড়ার চারপাশে ভালভাবে স্প্রে করে পোকা দমন করা যায়।

সার ব্যবস্থাপনা

জমির প্রকারভেদে সারের মাত্রা বিভিন্ন হয় তবে নিম্নোক্ত হারে সার প্রয়োগ করলে ভাল ফলন আশা করা যায়।

সারের নাম	কেজি/হেক্টর (সেচযুক্ত জমি)	কেজি/হেক্টর (সেচ বিহীন জমি)
ইউরিয়া	১৮০	১৩৫
টিএসপি	১২৫	১২৫
এমপি	১০০	১০০

সেচ বিহীন চাষে সমস্ত সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করা উত্তম। জমিতে সেচের সুবিধা থাকলে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে বর্ণিত ইউরিয়ার অর্ধেক ও অন্যান্য সারের সবটুকুই মাটির সাথে ভালভাবে মিশাতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া বীজ গজানোর ২০-৩০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

সরিষার জাত

বারি সরিষা-১৮ (ক্যানোলা টাইপ)

বারি সরিষা-১৮ ক্রুসিফেরী পরিবারের ব্রাসিকা ন্যাপাস প্রজাতির অন্তর্গত একটি সরিষার জাত। এ জাতটি বাংলাদেশে উদ্ভাবিত প্রথম "ক্যানোলা" বৈশিষ্ট্যের জাত। অস্ট্রেলিয়ার BN-1404 লাইন অধিকতর নির্বাচনের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ জাতটি ২০১৮ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধন করা হয়। এই জাতের সরিষার গাছের উচ্চতা ৮৮-১২৬ সে.মি. (অপেক্ষাকৃত খাটো)। বপন হতে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত সময়কাল ৯৫-১০০ দিন। সমগ্র বাংলাদেশে চাষ উপযোগী এ জাতের তেলে ইরুসিক এসিডের পরিমাণ ১.০৬%। যেখানে বর্তমানে বাংলাদেশে চাষকৃত অন্যান্য উন্নত সরিষার জাতে ইরুসিক এসিডের পরিমাণ ৩৫%-৪০%। পরিমাণ মতো সার ও সেচ প্রয়োগে এ জাত ২.০-২.৫ টন/হেক্টর (৫-৬ টন/একর) পর্যন্ত ফলন দেয়। এ জাতে তেলের পরিমাণ ৪০%-৪২%। পুষ্টির গুণাগণ বিবেচনায় বাণিজ্যিকভাবে সরিষা চাষের ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত এ জাত বাংলাদেশে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় জাত হিসেবে বিবেচিত হবে।

বারি সরিষা-১৮ এর ফসল

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: সরিষা বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ মাটিতে ভালো জন্মে।

জমি তৈরি: জমির প্রকারভেদে ৪-৫টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করতে হবে। জমির চারপাশে নালার ব্যবস্থা করলে পরবর্তীকালে সেচ দিতে এবং পানি নিকাশে সুবিধা হয়।

বপন পদ্ধতি: সরিষা বীজ সাধারণত ছিটিয়ে বোনা হয়। সারি করে বুনলে সার, সেচ ও নিড়ানী দিতে সুবিধা হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি রাখতে হবে। বপনের সময় জমিতে বীজের অঙ্কুরোদগমের উপযোগী রস থাকতে হবে।

বপনের সময়: বিভিন্ন অঞ্চলের তারতম্য এবং জমির 'জো' অবস্থা অনুসারে বারি সরিষা-১৮ এর বীজ মধ্য-আশ্বিন থেকে কার্তিক মাস (অক্টোবর থেকে নভেম্বর) পর্যন্ত বোনা যায়।

সারের পরিমাণ: জাত, মাটি ও মাটিতে রসের তারতম্য অনুসারে সার দিতে হয়। সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর) নিম্নরূপ:

সারের নাম	সারের পরিমাণ
ইউরিয়া	২০০-২৫০
টিএসপি	১৫০-১৭০
এমপি	৭০-৮৫
জিপসাম	১২০-১৫০
জিংক সালফেট	৪-৫
বরিক এসিড (প্রয়োজনবোধে)	১০
পচা গোবর	৮-১০ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: ইউরিয়া সার অর্ধেক ও অন্যান্য সার বপনের আগে এবং বাকি অর্ধেক ইউরিয়া গাছে ফুল আসার সময় উপরি প্রয়োগ করতে হয়। সার উপরি প্রয়োগের সময় মাটিতে রস থাকা দরকার।

বীজের হার: বারি সরিষা-১৮ এর জন্য প্রতি হেক্টরে ৬-৭ কেজি বীজ লাগে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: বীজ বপনের ১০-১২ দিন পর এক বার এবং ফুল আসার আগে ২০-২৫ দিন দ্বিতীয় বার নিড়ানী দিতে হয়।

সেচ প্রয়োগ: বারি সরিষা-১৮ এ উফশী জাতসমূহে পানি সেচ দিলে ফলন বেশি হয়। বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে (গাছে ফুল আসার আগে) প্রথম সেচ এবং ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে (ফল ধরার সময়) দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে। বপনের সময় মাটিতে রস কম থাকলে একটি হালকা সেচ দিলে ভাল হয়।

ফসল সংগ্রহ: ৯৫-১০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়।

বীজ সংরক্ষণ: মাড়াই করার পর রোদে শুকানো বীজ গরম অবস্থায় সংরক্ষণ করলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই রোদে শুকানো বীজ ঠাণ্ডা করে প্লাস্টিকের পাত্রে, টিনে বা ড্রামে রেখে মুখ এমনভাবে বন্ধ করতে হবে যেন পাত্রের ভিতরে বায়ু প্রবেশ করতে না পারে। সংরক্ষণের জন্য বীজ ভর্তি পাত্র মাটির সংস্পর্শে রাখা বাঞ্ছনীয়। বীজসহ পাত্র আর্দ্রতা কম এমন ঘরের শীতল স্থানে রাখলে ১ বছর এমনকি ২ বছর পর্যন্ত বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বজায় থাকে।

আলুর জাত

বারি আলু-৭৮ (সিআইপি-১১২)

উৎপত্তি স্থান: আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্র, লিমা, পেরু।

বংশ: 65-ZA-5 x CFK 69.1

অনুমোদিত: ২০১৭ খ্রি.।

গাছ: গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪/৬টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড গাঢ় সবুজ এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি নেই। পাতা গাঢ় সবুজ এবং মাঝারি আকারের। পাতা কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি হালকা/নেই।

আলু: আলু গোলাকার এবং মাঝারি আকারের। আলুর রং লাল, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং হলুদ। চোখ হালকা গভীর।

শুষ্ক পর্দাথ: ১৮.৭৫ ± ০.১১%।

অঙ্কুর: মাঝারি ওভোয়েড, গোড়ার দিকে বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক মাঝারি লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারি।

অঙ্কুরোদগম: সাধারণ তাপমাত্রায় ১০০- ১০৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।

জীবন কাল: ৮৫-৯০ দিন ।

ফলন: গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৪৬.৩৮ (৩৩.৯৮-৬১.৩৫) টন।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: এ জাতটি খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৭৮

বারি আলু-৭৯ (সিআইপি-১২৬)

উৎপত্তি স্থান: আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্র, লিমা, পেরু।

বংশ: 387521.3 x APHRODITE

অনুমোদিত: ২০১৭ খ্রি.।

গাছ: গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৬টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ, সবল এবং অধিক এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি আছে।পাতা কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর মধ্যম বিস্তৃতি আছে।

আলু: আলু লম্বাটে মধ্যম-বড় আকারের। আলুর রং লাল, চামড়া হালকা অমসৃণ। আলুর শাসের রং ক্রীম। চোখ অগভীর।

শুষ্ক পর্দাথ: ১৮.৮৫ ± ০.৪১%।

অঙ্কুর: মাঝারি কনিক্যাল, গোড়ার দিক অধিক পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক অধিক লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারি।

অঙ্কুরোদগম: সাধারণ তাপমাত্রায় ১০০- ১০৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়।
জীবন কাল: ৮৫-৯০ দিন ।

ফলন: গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৪২.৯২ (৩৫.২৩-৫৪.৪৯) টন।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: এ জাতটি খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৭৯

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচনঃ আলু ফসল যে কোন মাটিতে হতে পারে। তবে বেলে দো-আঁশ থেকে দো-আঁশ মাটি আলু চাষের জন্য উত্তম। উঁচু থেকে মাঝারী উঁচু জমি যেখানে সেচ ও নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা আছে সে সকল জমি নির্বাচন করতে হবে। জমিটি অবশ্যই রৌদ্র উজ্জ্বল হতে হবে। জমিটিতে অবশ্যই একবার ধান চাষ করতে হবে। আগাম ধান আবাদ করা জমি যেখানে ধান কাটার পরই আলুর আবাদ করা সম্ভব সে সকল জমি নির্বাচন করা সবচেয়ে ভাল।

জাত নির্বাচনঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই এ পর্যন্ত আলুর মোট ৮৩টি জাত (যার মধ্যে বারি আলু হিসেবে ৭৭ টি) অবমুক্ত করছে। মুক্তায়িত জাতগুলোর মধ্যে রয়েছে খাবার আলু, প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী আলু, রপ্তানিযোগ্য আলু, রোগপ্রতিরোধী, আগাম আলু ও সাধারণ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায় এমন আলুর জাত। এদের মধ্য থেকে প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক জাত নির্বাচন করতে হবে।

জমি তৈরিঃ মাটিতে "জোঁ" আসার পর গরুর লাঙ্গল বা যন্ত্র চালিত কর্ষণ যন্ত্র পাওয়ার টিলার/ট্রাক্টর দ্বারা গভীরভাবে আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে প্রস্তুত করতে হবে। আড়াআড়িভাবে কমপক্ষে ৪টি চাষ দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জমিতে বড় মাটির ঢেলা না থাকে এবং মাটি ঝুরঝুরে অবস্থায় আসে। কারণ বড় মাটির ঢেলা আলুর সঠিক বৃদ্ধিতে বাধাগ্রস্থ করে এবং অনেক সময় অসম ও বিকৃত আকার তৈরি করে। জমি তৈরির সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে জমিতে সুষম সেচ প্রদান করা যায়। সেজন্য জমির উপরিভাগ সমতল করতে হবে।

আলু বীজ সংগ্রহ ও পরিচর্যাঃ কোল্ড স্টোরেজ থেকে বীজ আলু বের করার পর ৪৮ ঘণ্টা প্রি হিটিং রুমে রাখতে হবে। বীজ আলু বাড়ীতে আনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বস্তা খুলে ছড়িয়ে আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য স্বাভাবিকভাবে বাতাস চলাচল করে এমন ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। কারণ বীজ কোল্ড স্টোরেজ থেকে বের করে বস্তা বন্ধ অবস্থায় রাখলে ঘেমে পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বীজ শোধনঃ কোল্ড স্টোরেজে রাখার আগে বীজ শোধন না হয়ে থাকলে অংকুর গজানোর পূর্বে বীজ আলু দাঁদ বা স্ক্যাব এবং ব্ল্যাক স্কার্ফ রোগ প্রতিরোধের জন্য ৩% বরিক এসিড দিয়ে শোধন করে নিতে হয় (১ লিটার পানি + ৩০ গ্রাম হারে বরিক এসিড মিশিয়ে বীজ আলু ১০-১৫ মিনিট চুবিয়ে পরে ছায়ায় শুকাতে হবে)। পলিথিন সিটের উপর আলু ছড়িয়ে স্প্রে করেও কাজটি করা যায়। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন আলুর সকল অংশ ভিজে যায়।

বীজের পরিমাণঃ সাধারণত হেক্টরপ্রতি ১.৫-২.০ টন বীজ আলু প্রয়োজন ।

বীজ তৈরিঃ অঙ্কুর গজানোর পর ১ম কুঁড়িটি ভেঙ্গে নিতে হবে। কারণ ১ম কুঁড়ি ভেঙ্গে দেয়ার পর অন্যান্য কুঁড়ি সমান ভাবে বৃদ্ধির সুযোগ পায়। আলু ফসলের জন্য

৩০-৪০ গ্রাম ওজনের আস্ত আলু বীজ হিসেবে ব্যবহার করা উত্তম। কেটেও বীজ লাগানো যেতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রতিটি কর্তিত অংশে কমপক্ষে ২টি চোখ থাকে। বীজ লাগানোর ২-৩ দিন পূর্বে আলু কেটে ছায়াযুক্ত স্থানে আর্দ্র আবহাওয়ায় রেখে দিলে কাটা অংশের উপর একটা প্রলেপ পড়ে ফলে মাটি বাহিত রোগ জীবাণু সহজে বীজে প্রবেশ করতে পারবে না। অন্যভাবে ছাই মেখেও কাজটি করা যেতে পারে। এতে আলু পচন অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব। আলু কাটার সময় প্রতিটি আলু কাটার পর সাবান পানি দ্বারা ছুরি বা বটি পরিষ্কার করা উচিত যাতে রোগ জীবাণু এক বীজ থেকে অন্য বীজে না ছড়ায়। বীজ আলু আড়াআড়ি ভাবে না কেটে লম্বালম্বিভাবে কাটতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে যাতে প্রতিটি অংশে কমপক্ষে দুটি চোখ বা কুঁড়ি থাকে।

রোপণ সময়: বাংলাদেশে বর্তমানে ১৫ কার্তিক থেকে ১৫ অগ্রহায়ণ (নভেম্বর মাস) আলু লাগানোর উপযুক্ত সময়। তবে এর আগে এবং পরেও আলু লাগানো সম্ভব। সেক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফলন ও মান অনেক ক্ষেত্রে নাও হতে পারে।

রোপণ পদ্ধতি: গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে প্রচলিত বর্তমান পদ্ধতিতে সারি থেকে সারি দূরত্ব ৬০ সেমি। বীজ থেকে বীজের দূরত্ব আস্ত আলু বীজের জন্য ২৫ সে.মি. এবং কাটা আলুর জন্য ১০-১৫ সে.মি.।

সারের পরিমাণ: দেশের বিভিন্ন স্থানের মাটির উর্বরতা বিভিন্ন রকমের এজন্য সারের চাহিদা সকল জমির জন্য সমান নয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত "সার সুপারিশ গাইড" অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করতে হবে। কারণ জমিতে খাদ্য উপাদানের অভাব হলে আলু গাছে ভাইরাস রোগের লক্ষণ শনাক্ত করতে অসুবিধা হয়। এছাড়া কাঙ্ক্ষিত ফলনও পাওয়া যাবে না। কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই নিম্নলিখিত সারের সুপারিশ করেছে। স্থান ভেদে তা বিএআরসি এর সার সুপারিশ গাইডের সাথে মিল রেখে কম/বেশি করে ব্যবহার করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ		
	হেক্টরে	কেজি/বিঘা	কেজি/শতক
ইউরিয়া	৩২৫-৩৫০ কেজি	৪৪.৭৮-৪৮.২৩	১.৩২-১.৪২
টিএসপি	২০০-২২০ কেজি	২৭.৫৬-৩০.৩২	০.৮১-০.৮৯
এমপি	২২০-২৫০ কেজি	৩০.৩২-৩৪.৪৫	০.৮৯-১.০১
জিপসাম	১০০-১২০ কেজি	১৩.৭৮-১৬.৫৪	০.৪০-০.৪৯
জিংক সালফেট	৮-১০ কেজি	১.১০-১.৩৮	০.০৩২-০.০৪০
বোরন (প্রয়োজনবোধে)	৬-৮ কেজি	০.৮৩-১.১০	০.০২৪-০.০৩২
গোবর	১০ টন	১,৩৭৮.০০	৪১.০০

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: গোবর ও জিংক সালফেট শেষ চাষের সময় জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক ইউরিয়া, সম্পূর্ণ টিএসপি, এমপি, জিপসাম ও বোরন সার রোপণের সময় সারির দুই পার্শ্বে বা জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর অর্থাৎ দ্বিতীয়বার মাটি তোলার সময় উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তবে ব্যান্ড ভালো পদ্ধতিতে বীজ রোপণ লাইনের উভয় পার্শে ১০-১২ সেমি দূরে লাইন টেনে সার দেওয়া ভালো। এতে সারের সঠিক প্রয়োগ হয়। সার প্রয়োগের পর সাথে সাথে সার ও বীজ মাটি দিয়ে ভেলি তুলে ঢেকে দিতে হবে।

সার প্রয়োগের নালা এবং বীজ আলু রোপণের সারির নক্সা নিম্নে দেখানো হল:

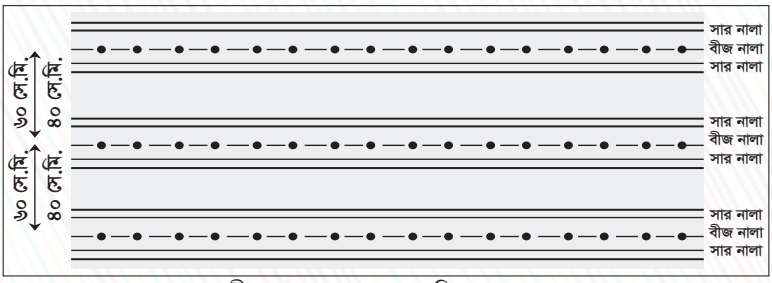

সার প্রয়োগের নালা এবং বীজ আলু রোপণের সারির নক্সা

সেচ প্রয়োগ: বীজ রোপণের পর জমিতে পরিমিত রস না থাকলে সেচ দেওয়া উত্তম, তবে খেয়াল রাখতে হবে ক্ষেতে কোনভাবেই পানি না দাঁড়ায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পানিতে ভেলির ২/৩ অংশ পর্যন্ত ডুবে যায়। এছাড়াও ২-৩ টি সেচ প্রয়োগ করা প্রয়োজন হতে পারে (২০-২৫ দিনের মধ্যে স্টোলন বের হওয়ার সময়। ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে গুটি বের হওয়া পর্যন্ত এবং পরে আলু বৃদ্ধির সময়)। জমি থেকে আলু উঠানোর ৭-১০ দিন পূর্বে মাটি ভেদে সেচ প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে, দাঁদ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য আলু রোপণের পর ৩০-৫০ দিনের সময়ে জমিতে কোন অবস্থায় রসের ঘাটতি এবং ৬০-৬৫ দিনের পর রসের আধিক্য হতে দেয়া যাবে না।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: আলুর জমি সর্বদা আগাছামুক্ত রাখা উচিত। আলু লাগানোর ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে আগাছা পরিষ্কার করে দুই সারির মধ্যবর্তী স্থান কুপিয়ে উপরি সার প্রয়োগ করতে হবে। সার মিশ্রিত মাটি গাছের গোড়ায় তুলে দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, কোপানোর সময় যাতে আলু শিকড় বা স্টোলন না কাটে এবং মাটি দেওয়ার সময় গাছের পাতা মাটি চাপা না পড়ে। ৫৫-৬০ দিন পর প্রয়োজন হলে পূণরায় আগাছা পরিষ্কার করে মাটি তুলে দিতে হবে। এছাড়াও পরবর্তীতে কোন কারণে আলু মাটির উপরে উন্মুক্ত হলে তা দেখার সাথে সাথে মাটি তুলে ঢেকে দিতে হবে। প্রয়োজনমতো রোগবালাই ও পোকামাকড়

দমন করতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে জমি থেকে দূরে ফেলে দিতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এতে ক্ষেতে আলুর মড়ক রোগসহ বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

রোগিং: মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদনে রগিং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সঠিকভাবে রোগিং করা না হলে বীজ আলুর গুণাগুণ কমে যায়। এ জন্য গাছের বয়স ৩০-৩৫ দিন থেকে শুরু করে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত নিয়মিত আলুর জমিতে বিভিন্ন জাতের মিশ্রিত গাছ, অস্বাভাবিক এবং রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে ভাইরাস রোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সর্তকতার সাথে আলু গাছ মাটির নিচে আলুসহ উঠিয়ে অন্যত্র মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে। সকালে এবং বিকালে রগিং এর জন্য উপযুক্ত সময়। সূর্যের বিপরীত দিকে মুখ করে রগিং করতে হবে যেন পাতায় সকল লক্ষণ স্পষ্ট বুঝা যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন রোগাক্রান্ত গাছ কোনক্রমেই কোন সুস্থ গাছের সঙ্গে না লাগে এবং শ্রমিকের হাতের স্পর্শ দ্বারাও যেন সুস্থ গাছ রোগ সংক্রমণ না হয়। বীজ ফসলের ক্ষেতে বীজ আলু মাটি ভেদ করে উঠে আসার পর থেকে হাম পুলিং পর্যন্ত ৪/৫ দিন অন্তর অন্তর ফসলের মাঠে যেয়ে রোগিং করতে হবে। রোগমুক্ত মানসম্পন্ন আলু উৎপাদন করায় রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার।

হামপুলিং বা গাছ উপড়ে ফেলা: হামপুলিং হলো গাছ টেনে উপড়ে ফেলা। হামপুলিং এর ৭-১০ দিন পূর্ব হতে সেচ বন্ধ করতে হবে। তবে বালি মাটি হলে ৫-৭ দিন পূর্বে সেচ বন্ধ করা ভালো। বেশিদিন পূর্বে সেচ বন্ধ করলে বালি মাটির আলুতে হিট ইনজুরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হামপুলিং করার সময় মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকলে গাছ ক্ষেত থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। যদি পর্যাপ্ত রস না থাকে তবে গাছ দ্বারা পিলি ঢেকে দিতে হবে। যাতে হিট ইনজুরি হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। ফসল কর্তন (Crop Cutting) করে আলুর আকার ও ফলন দেখে হামপুলিং এর তারিখ নির্ধারণ করতে হবে।

মাঠে মাটির নিচে কিউরিং: হামপুলিং এর পর মাটি ও আলুর অবস্থার উপর নির্ভর করে ৭-১০ দিন পর্যন্ত মাটি নিচে রেখে আলুর ত্বক শক্ত করতে হবে। আলুর ত্বক শক্ত হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য আলু তুলে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা আলুর ত্বকে চাপ দিতে হবে। চামড়া না উঠলে বুঝা যাবে কিউরিং হয়েছে। অথবা চটের বস্তায় ২/৩ কেজি নমুনা আলু উঠিয়ে ঝাকুনি দিতে হবে। যদি ছাল না উঠে তবে বুঝা যাবে কিউরিং হয়েছে। বীজআলু মাটির নিচে থাকা অবস্থায় প্রয়োজনে লাইনে মাটি দিয়ে আলু ঢেকে দিতে হবে যেন সূর্যালোকে আলুতে সবুজায়ন ও হিট ইনজুরি না হতে পারে।

আলু উঠানো/সংগ্রহঃ শুষ্ক, উজ্জ্বল ও ভালো আবহাওয়াতে আলু উত্তোলন করতে হবে। এক সারির পর এক সারি কোদাল বা লাঙ্গল দিয়ে আলু উঠাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আলু আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। আলু উঠানোর পর প্রখর রৌদ্রে রাখা যাবে না। মাঠে প্রাথমিক বাছাইয়ের মাধ্যমে কাটা, ফাটা, আংশিক পচা আলু বাতিল হিসাবে পৃথক করতে হবে যেন ভাল আলুর গাদার সাথে মিশ্রিত হতে না পারে। মাঠে বস্তায় অথবা চট দ্বারা আবৃত ঝুড়িতে ভরে সতর্কতার সাথে অস্থায়ী শেডে পরিবহন করে আনতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আলুর বস্তা বা ঝুড়ি আছড়িয়ে ফেলে আলু ফাটিয়ে বা আলুর ছাল উঠিয়ে থেতলিয়ে ফেলা না হয়।

অস্থায়ী শেড নির্মাণ ও অস্থায়ী শেডে কিউরিংঃ আলু উৎপাদন মাঠ বা ব্লকের কাছাকাছি ছায়াযুক্ত ঠাণ্ডা ও সহজে বাতাস চলাচল করে এমন উপযোগী করে অস্থায়ী শেড তৈরি করতে হবে। মাঠ থেকে কেবল মাত্র প্রাথমিক বাছাইকৃত আলু শেডের মেঝেতে বিছিয়ে রাখতে হবে যেন আলুর স্তুপ ৪৫ সে.মি. এর বেশি উঁচু না হয়। এ অবস্থায় কমপক্ষে ৩-৫ দিন কিউরিং করতে হবে।

সর্টিং-গ্রেডিংঃ আলু সংরক্ষণ করার জন্য অবশ্যই ভালোভাবে বাছাই করা দরকার। বাছাই ভাল হলে সংরক্ষণ/ রপ্তানিযোগ্য আলুর মান ভাল হবে। রোগাক্রান্ত, আঘাতপ্রাপ্ত, আংশিক কাটা, ফাটা, অসম আকৃতির ও অতীব সবুজায়নকৃত আলু সঠিকভাবে বাছাই করে পরে বস্তাবন্দী করতে হবে। বাছাইকৃত আলুতে দু-একটি রোগাক্রান্ত বা খারাপ আলু থাকলে অবশিষ্ট আলুর মান ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং আলু রপ্তানির সময় জাহাজেই পচে নষ্ট হবে।

আলু সংরক্ষণঃ সর্টিং-গ্রেডিং করার পর আলু নির্দিষ্ট সাইজের বস্তায় (৮০/৫০ কেজি) করে কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করতে হবে। বীজ আলু অবশ্যই কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করতে হবে। তবে কিছু পরিমাণ খাবার আলু কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে জাত ভেদে ৩-৫ মাস সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

মিষ্টি আলুর জাত

বারি মিষ্টি আলু-১৪

বাংলাদেশ মিষ্টি আলুর কৌলিক ভিত্তির ব্যাপকতা সীমিত। ১৯৮৫ খ্রি. হতে উদ্ভাবিত ১৩টি জাত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত হচ্ছে। পরবর্তীতে ২০০৮ খ্রি. কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্র হইতে কিছু উন্নত লাইন পাওয়া যায় যা কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র হতে মূল্যায়িত হয়েছে। এর মধ্যে "বারি মিষ্টি আলু-১৪ (CIP-441132)" জাতটি খুবই প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। নিম্ন বর্ণিত জাতটির উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ ও চাষাবাদ পদ্ধতি সংক্ষেপে দেয়া হলো।

বারি মিষ্টি আলু-১৪

গাছ

কাণ্ড মধ্যম পুরু এবং সবুজ বর্ণের। পাতা খাঁজ কাটা, মধ্য শিরা পর্যন্ত পৌঁছায়। কচি ও বয়স্ক পাতার বর্ণ সবুজ কিন্তু কিনারা বেগুনী। পাতার উল্টা দিকের শিরা বেগুনী বর্ণের । কাণ্ডের অগ্রভাগ কিছুটা রোমশ। কন্দমূল লম্বাটে ও অনিয়মিত। কন্দমূলের বর্ণ হালকা গোলাপী ও শাঁস কমলা বর্ণের, শাঁসের শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২৪.১২ ± ১ %। আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত কালার চার্ট অনুযায়ী প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে বিটা ক্যারোটিনের পরিমাণ ৪.৯২ মিলিগ্রাম।

বারি মিষ্টি আলু-১৫

বাংলাদেশ মিষ্টি আলুর কৌলিক ভিত্তির ব্যাপকতা সীমিত। ১৯৮৫ খ্রি. হতে উদ্ভাবিত ১৩টি জাত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত হচ্ছে। পরবর্তীতে ২০০৮ খ্রি. কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্র হতে কিছু

বারি মিষ্টি আলু-১৫

উন্নত লাইন পাওয়া যায় যা কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র হতে মূল্যায়িত হয়েছে। এর মধ্যে "বারি মিষ্টি আলু-১৫ (CIP-440267.2)" জাতটি খুবই প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। নিম্ন বর্ণিত জাতটির উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ ও চাষাবাদ পদ্ধতি সংক্ষেপে দেয়া হলো।

গাছ

কাণ্ড মধ্যম পুরু এবং সবুজ বর্ণের। পাতা খাঁজ কাটা নয়। কচি ও বয়স্ক পাতার বর্ণ সবুজ । পাতার উল্টা দিকের শিরা বেগুনী বর্ণের। কাণ্ডের অগ্রভাগ কিছুটা রোমশ। কন্দমূল লম্বাটে ও অনিয়মিত। কন্দমূলের বর্ণ হালকা গোলাপী ও শাঁস কমলা বর্ণের, শাঁসের শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২২.৩৯±১ %। আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত কালার চার্ট অনুযায়ী প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে বিটা ক্যারোটিনের পরিমাণ ৪.৪১ মিলিগ্রাম।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও জলবায়ুর উপযোগিতা

অন্যান্য উচ্চ ফলনশীল মিষ্টি আলু জাতের মতই পানি নিষ্কাশনের জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ বেলে দো-আঁশ মাটি এ জাতের জন্য উপযুক্ত। বাংলাদেশে রবি মৌসুমে এ জাত চাষের জন্য উপযোগী।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ জাতটি চাষাবাদের জন্য ভিন্ন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করার দরকার হবে না। অনুমোদিত মিষ্টি আলু জাতের ন্যায় চাষাবাদ করলেই চলে। লতা লাগানোর উপযুক্ত সময় হচ্ছে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত। তবে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত লাগানো যেতে পারে এবং তাতে ফলনের তেমন ক্ষতি হবে না। লতার অগ্রভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড রোপণ করলে ফলন বেশি পাওয়া যায়। প্রতিটি খণ্ডের দৈর্ঘ্য হবে ২৫-৩০ সে.মি.। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সে.মি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব হবে ৩০ সে.মি.। উপযুক্ত দূরত্বে চারা রোপণ করলে প্রতি হেক্টরে চারার প্রয়োজন হবে ৫৫,৫৫০ টি।

মিষ্টি আলুর এ জাতটির সারের চাহিদা অন্যান্য উন্নত জাতের মতোই। হেক্টরপ্রতি ৫-১০ টন গোবর, ১৪০ কেজি ইউরিয়া, ৮০ কেজি টিএসপি এবং ১৫০ কেজি মিউরেট অব পটাশ প্রয়োগ করা যেতে পারে। গোবর, টিএসপি ও পটাশ সার জমি

তৈরির সময়, অর্ধেক ইউরিয়া চারা রোপণের ৩০ দিন পর এবং বাকি অর্ধেক ৬০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হয়। সেচের পরিমাণ ও সময় নির্ভর করবে মাটিতে কি পরিমাণ রস আছে তার উপর। সাধারনত দুটি সেচ দিতে হয় প্রথমটি চারা রোপণের ৩০ দিন পর এবং দ্বিতীয়টি ৬০ দিন পর। চারা রোপণ করে পরবর্তীতে দুই কিস্তিতে সারি বরাবর মাটি তুলে আইল উঠাতে হয়। প্রথমবার চারা রোপণের ১৪-১৫ দিন পর এবং দ্বিতীয়বার চারা রোপণের ৩০-৪০ দিন পর। এ ছাড়া পানি সেচের পর মাটির "জোঁ" অবস্থায় গাছের গোড়ায় মাটি উঠায়ে দিতে হবে। চারা রোপণের পর থেকে চারার বয়স ৩৫-৪০ দিন না হওয়া পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। মিষ্টি আলুর এ জাতের কোন উল্লেখযোগ্য রোগ মাঠ পর্যায়ে দেখা যায় না। অন্যান্য জাতের মতো এ প্রকার মিষ্টি আলুর জাতের উইভিল পোকার আক্রমণ দেখা যেতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলি লিটার ডারস্বান-২০ ইসি প্রয়োগ করে এ পোকা দমন করা যেতে পারে তাছাড়া ফেরোমন ফাঁদ পেতে পুরুষ উইভিল মেরে ফেলা সম্ভব। এতে নতুন উইভিলের আক্রমণ কম হবে।

ফলন

বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা গেছে যে, এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বারি মিষ্টি আলু-৮ জাতের তুলনায় বেশি। এ জাতটি ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৬-১৭ ইং সনে আঞ্চলিক ফলন যাচাই করার জন্য বিএআরআই এর পাঁচটি কেন্দ্রে চাষ করা হয়। পরীক্ষার গড় ফলন ছিল ৩৩.৪৪ টন/হেক্টর। এছাড়া জামারপুর, বগুড়া, যশোর ও পাহাড়তলীর কিছু কিছু চাষীর জমিতে এ জাতের প্রদর্শনী করা হয়েছিল। কৃষকরা এ জাতের ফলন দেখে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন। উচ্চ ফলন এবং সিদ্ধ করলে তাড়াতাড়ি নরম হয় না বলে এ জাত কৃষকের কাছে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে।

সংরক্ষণ

স্বাভাবিক পরিবেশে এ জাত প্রায় ২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় যা অন্যান্য উন্নত জাতগুলোর চেয়ে প্রায় ১ মাস বেশি।

ওলকচুর জাত

বারি ওলকচু -১

বারি ওলকচু -১ এর গুঁড়িকন্দ

বৈশিষ্ট্যঃ পত্রকগুলি ঘনভাবে বিন্যস্ত, একটার সাথে আরেকটা লেগে থাকে। কাণ্ডে সাদা ছোপ ছোপ দাগগুলো বড় আকারের এবং অল্প সংখ্যক কাঁটা কাঁটা গঠন থাকে বিধায় কাণ্ডটি হালকা খসখসে হয়। প্রধান গুড়িকন্দ বড় আকারের হয়, প্রতিটি গুড়িকন্দ হতে গড়ে ৩-৩.৫ টি করমেল উৎপন্ন করে। গুড়িকন্দের মাংশল অংশ ক্রিম রঙের এবং ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। একক গুড়িকন্দের ওজন ২-৫ কেজি। হেক্টরপ্রতি ফলন : ৪৫-৫৫ টন।

উপযোগী এলাকাঃ বাংলাদেশে সব অঞ্চলেই উঁচু জমিতে চাষ করা যায়।

বপনের সময়ঃ মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি-মধ্য মার্চ) মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। প্রয়োজনে মধ্য-চৈত্র থেকে মধ্য-বৈশাখ (এপ্রিল) মাসেও লাগানো যায় তবে এরপরে রোপণ করলে ফলন কমে যায়।

ফসল উত্তোলনের সময়ঃ ২১০-২৭০ দিন পর।

বারি ওলকচু-২

বারি ওলকচু -২ এর গুঁড়িকন্দ

বৈশিষ্ট্যঃ পত্রকগুলি হালকাভাবে বিন্যস্ত, একটা থেকে আরেকটা পৃথক থাকে। কাণ্ডে সাদা ছোপ ছোপ দাগগুলো ছোট আকারের এবং অধিক সংখ্যক কাঁটা কাঁটা গঠন থাকে বিধায় কাণ্ডটি বেশ খসখসে হয়। প্রধান গুড়িকন্দ মাঝারী আকারের হয়, প্রতিটি গুড়িকন্দ হতে গড়ে ৮-৯ টি করমেল উৎপন্ন করে। গুড়িকন্দের উপরের অংশ পার্পল রঙের, এর মাংশল অংশ হলুদ বর্ণের। একক গুড়িকন্দের ওজন ১-৩ কেজি। হেক্টরপ্রতি ফলন : ৩৫-৪৫ টন।

উপযোগী এলাকাঃ বাংলাদেশে সব অঞ্চলেই উঁচু জমিতে চাষ করা যায়।

বপনের সময়: মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। প্রয়োজনে মধ্য-চৈত্র থেকে মধ্য-বৈশাখ (এপ্রিল) মাসেও লাগানো যায় তবে এরপরে রোপণ করলে ফলন কমে যায়।

ফসল উত্তোলনের সময়: ২১০-২৭০ দিন পর।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন ও তৈরি: সু-নিষ্কাশিত এঁটেল দোআঁশ, বেলে দোআঁশ মাটি উপযোগী। অতিরিক্ত এঁটেল ও বেলে মাটিতে চাষ না করাই ভাল। মাটির 'জোঁ' থাকা অবস্থায় মাটির প্রকারভেদে ৩-৪ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিয়ে ভাল করে মই দিয়ে মাটি চেপে দিতে হবে।

বীজ তৈরি: সাধারণত বিভিন্ন আকারের মুখী এক/দুই বছর আবাদ করার পর যে গুড়িকন্দ তৈরি হয় তাই বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে ছোট আকারের গুড়ি কন্দগুলিকে এক বছর রোপণ করে বীজ তৈরি করতে হয়।

বীজ বপনের সময়: মধ্য -মাঘ থেকে মধ্য-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। প্রয়োজনে মধ্য-চৈত্র থেকে মধ্য-বৈশাখ (এপ্রিল) মাসেও লাগানো যায় তবে এরপরে রোপণ করলে ফলন কমে যায়।

বীজ বপনের দূরত্ব: অন্যান্য ফসলের মত ওলকচুর জন্য কোন একক দূরত্ব নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বীজের আকারের অসমতার জন্য বিভিন্ন আকারের বীজ বিভিন্ন দূরত্বে বপন করতে হবে।

স্বাভাবিক ও বাণিজ্যিক উৎপদনের জন্য বীজ বপনের দূরত্ব।

বীজের আকার (গ্রাম)		বপনের দূরত্ব (সেমি)	
স্বাভাবিক	বাণিজ্যিক	স্বাভাবিক	বাণিজ্যিক
৫০	৪০০-৬০০	৫০ সেমি × ৪০ সেমি	৬০ সেমি × ৫০ সেমি
৫০-২০০	৬০০-৮০০	৬০ সেমি × ৪৫ সেমি	৬০ সেমি × ৬০ সেমি
২০০-৪০০	৮০০-১০০০	৬০ সেমি × ৫০ সেমি	৭৫ সেমি × ৬০ সেমি

বীজ বপনের পদ্ধতি: মুখী ও ছোট গুড়ি বপনের জন্য আলুর মত নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। লাঙ্গল দিয়ে লাইন তৈরি করে নির্দিষ্ট দূরত্বে বীজ বসিয়ে মাটি তুলে দিতে হবে বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য নিদিষ্ট দূরত্বে গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের আকার বীজের ব্যাসের চেয়ে একটু বড় হবে। গভীরতা হবে ব্যাসের তিন গুণ। তবে কন্দের ভিন্নতার উপর গর্তের আকার আকৃতি ভিন্ন হয়।

ফসলের পরিচর্যা

সার প্রয়োগঃ আশানুরূপ ফলন পেতে হলে নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
গোবর বা আবর্জনা পচা সার	২০ টন
ইউরিয়া	৩২৫ কেজি
টিএসপি	২১০ কেজি
এমপি	১৭৫ কেজি

সম্পূর্ণ গোবর এবং ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সারের অর্ধেক জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক বীজ বপনের গর্তে বা লাইনে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান বা ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। রোপণের ৮০-৮৫ দিন পর ভালভাবে আগাছা পরিষ্কার করে প্রথমবার এবং ১১০-১১৫ দিন পর দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করতে হবে।

পরিচর্যাঃ বীজ লাগানোর পরে যদি মাটির 'জোঁ' না থাকে এবং বৃষ্টিপাত না হয় তবে সেচ দিতে হবে। দুই সারি বা প্রতি সারির পার্শ্ব দিয়ে হালকা নালা তৈরি করে দিতে হবে যাতে সহজেই বৃষ্টির পানি চলে যেতে পারে। ধান, গমের খড় বা কচুরিপানা দ্বারা আচ্ছাদন (মালচ) দিলে ফলন অনেক গুন বৃদ্ধি করা যায় এবং সহজেই আগাছা দমন করা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, বিভিন্ন আচ্ছাদন ব্যবহার করে শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। জমি সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

কীট পতঙ্গ ও রোগ বালাইয়ের প্রতিকারঃ ওলকচুর ক্ষেত্রে কীট পতঙ্গ ও রোগ বালাইয়ের তেমন কোন সমস্যা নেই। তবে মাঝে মাঝে লিফ ব্লাইট (পাতা ও ডগা পচা রোগ), কলার রট প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়।

লিফ বাইটঃ এ রোগে পাতা বেশি আক্রান্ত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কাণ্ডতে ও লিফ ব্লাইট রোগের লক্ষণ দেখা যায়। এ রোগের প্রতিকারের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২.০ গ্রাম ডায়থেন এম-৪৫ বা রিডোমিল এম জেড বা এক্রোবেট এম জেড ছত্রাকনাশক ১৫ দিন পর পর ৩ বার প্রয়োগ করতে হবে।

কলার রটঃ এ রোগ শস্যের বৃদ্ধির শেষের দিকে দেখা যায়। এ রোগে মাটির সংযুক্ত স্থান আক্রান্ত হয়। কলার রট রোগে আক্রান্ত গাছ মাটি থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে। আক্রান্ত গাছে ভিটাভ্যাক্স-২০০ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম মিশিয়ে সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ করতে হবে।

ফসল সংগ্রহঃ একটি কন্দ থেকে ২-৪ টি পর্যন্ত ভূয়া কাণ্ড বের হতে দেখা যায়। একটি নতুন ভূয়া কাণ্ড বের হওয়ার পর পুরানটি মারা যায়। ক্ষেতে যখন শতকরা ৮০ ভাগ গাছ হলুদ হয়ে যায় তখন ফসল পরিপক্ক হবে এবং তখন থেকে ফসল সংগ্রহ করা যাবে। বীজের জন্য ক্ষেতের গাছ সম্পূর্ণ রুপে শুকিয়ে মারা যাওয়ার পর সংগ্রহ করতে হবে। বাজার মূল্য এবং বাজারের চাহিদা মোতাবেক ঠিকমত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে সংগ্রহ করতে হবে। অপরিপক্ক ওলও সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বীজ সংরক্ষণঃ ওলের গুড়িকন্দ, ক্ষুদ্রাকার গুড়িকন্দ ও মুখী বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বীজ তোলার সময় যদি ভিজা থাকে তবে তা হালকা রোদে শুকিয়ে শীতল স্থানে সংরক্ষণ করতে হয়। দীর্ঘ দিন সংরক্ষণ করতে হলে ছায়াযুক্ত মাটিতে সমানভাবে গর্ত করে তার ভেতর ওল পাশাপাশি সাজিয়ে ১৫-২০ সেমি বালি মিশ্রিত মাটি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। বীজ যে জমিতে থাকে যদি অন্য কাজে প্রয়োজন না হয় তবে জমিতেই রেখে দেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পূর্বে বীজ উঠিয়ে পুণরায় রোপণ করতে হবে।

মসুরের জাত

বারি মসুর-৯

পাতা ও কাণ্ড হালকা সবুজ রঙের, ফুল নীলাভ সাদা, বীজ হালকা ধুসর বর্ণের এবং জীবনকাল ৮৫-৯০ দিন। এ জাতটি পাতা ঝলসানো রোগ সহনশীল, ১০০ বীজের ওজন ২.২২-২.৯৬ গ্রাম এবং গড় ফলন- ১.১৯ - ১.৫২ টন/হেক্টর। জাতটি আমন ও বোরো ধানের মধ্যবর্তী সময়ে সহজেই চাষোপযোগী ।

বারি মসুর-৯

শস্য পরিক্রমা

মসুর চাষের প্রধান অঞ্চলগুলিতে সাধারণত আমন-মসুর-পতিত, আউশ/পাট-পতিত-মসুর এবং আউশ/পাট-মাসকলাই/মুগ-মসুর পরিক্রমায় চাষ করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটি আমন এবং বোরো ধানের মধ্যবর্তী সময়ে সারাদেশে চাষ করা সম্ভব।

জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে.	অক্টো.	নভে.	ডিসে.	জানু.	ফেব্রু.	মার্চ	এপ্রি.	মে	জুন

আমন ধান

বারি মসুর-৯

বোরো ধান

ফসল ধারা: আমন ধান-মসুর-বোরো ধান

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন ও তৈরি

সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত, উঁচু বা মাঝারী উঁচু দোআঁশ, পলি দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটিতে মসুর ভাল জন্মে। উপযুক্ত 'জোঁ' অবস্থায় জমির প্রকার ভেদে ২-৪ টি আড়াআড়িভাবে চাষ ও মই দিয়ে ভালোভাবে মাটি ঝুরঝুরে করতে হবে। পানি জমেনা অথবা পানি নিষ্কাশনের নালা আছে এমন জমি মসুর চাষের উপযুক্ত। একক ফসল অথবা রিলে (সাথী) হিসেবে প্রস্তাবিত মসুরের জাতটি চাষের উপযোগী। একক ফসল হিসেবে আবাদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত 'জোঁ' অবস্থায় ২-৩ টি গভীর চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। সেই সময় জমিতে আগাছা থাকলে তা যতদুর সম্ভব সরিয়ে ফেলতে হবে।

সারের মাত্রা

ডাল জাতীয় ফসলে সাধারণত সার কম পরিমাণ প্রয়োজন হয় তাই মসুর চাষে রাসায়নিক সার কম পরিমাণ প্রয়োগ করতে হবে। বিঘাপ্রতি ৪ কেজি ইউরিয়া, ৫ কেজি এমওপি, ১০ কেজি টিএসপি, ৭ কেজি জিপসাম ও ১.৫ কেজি বোরন সার শেষ চাষের সময় মাটিতে ভালোভাবে মেশিয়ে দিতে হবে।

বপনের সময়

কার্তিক মাসের মাঝামাঝি থেকে তৃতীয় সপ্তাহ (নভেম্বরের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত) বীজ বপনের উত্তম সময়, এতে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এছাড়াও নভেম্বর মাসের ৩য় সপ্তাহ পর্যন্ত বপন করা যেতে পারে।

বীজের হার ও বীজ শোধন

জমিতে আর্দ্রতা কম থাকলে বীজকে ৫-৬ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে বীজের পানি ঝরানোর পর বপন করলে সহজেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। বীজ বপন পদ্ধতি ও অঙ্কুরোদ্‌গম ক্ষমতার উপর বীজের হার নির্ভর করে। বীজ গজানোর হার ভালো হলে (শতকরা ৯০ ভাগ বা তার বেশি) হেক্টরপ্রতি একক চাষের ক্ষেত্রে ৫০-৬০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। মাটি ও বীজ বাহিত অনেক জীবাণুর সংক্রমণ হতে রক্ষার জন্য মসুর বীজ বপনের পূর্বে অবশ্যই প্রোভেক্স ২০০ ডব্লিউ পি (কার্বোক্সিন+থিরাম) ২.৫ গ্রাম প্রতি কেজি বীজে মিশিয়ে শোধন করতে হবে।

বপন পদ্ধতি

মসুর দু'ভাবে অর্থাৎ সারিতে ও ছিটিয়ে বপন করা যায়। সারিতে বীজ বপন করলে গাছ সমানভাবে বৃদ্ধি পায়। এছাড়া বিভিন্ন অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা যেমন- আগাছা দমন, রোগ ও পোকা ব্যবস্থাপনা, সেচ প্রয়োগ, পানি নিষ্কাশন ও পরিশেষে ফসল সংগ্রহ সহজ হয়। প্রস্তাবিত জাতটির গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির এবং তুলনামূলকভাবে কম শাখা বিশিষ্ট হওয়ায় সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০-২৫ সেন্টিমিটার বা ৮-১০ ইঞ্চি করা ভাল।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

মসুর বীজ বপনের সময় জমিতে পরিমিত মাত্রায় রস না থাকলে বীজ বপনের পরপরই সেচ দিতে হবে অথবা বীজ বপনের পূর্বেই সেচ দিয়ে 'জোঁ' অবস্থান এনে বীজ বপন করতে হবে। এতে বীজ গজানোর হার ভাল হবে এবং কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ চারা গজাবে। পানি নিষ্কাশনের জন্য অবশ্যই নালার ব্যবস্থা থাকতে হবে অন্যথায় সেচের বা বৃষ্টির পানি জমে থাকলে শিকড় পচে গাছ মারা যেতে পারে। ফসলের বৃদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত ফলনের ক্ষেত্রে আগাছা অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এজন্য জমিকে ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। বীজ গজানোর ১০-১৫ দিন পর কোদাল দিয়ে দুই সারির মাঝ বরাবর কুপিয়ে আগাছা দমন ও মাটির চটাভাব দূর করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

রোগ ব্যবস্থাপনা

গোড়া পচা

Sclerotium rolfsii নামক মাটিতে বসবাসকারী এক প্রকার ছত্রাক দ্বারা এ রোগ সংঘটিত হয়। চারা গাছে এ রোগ বেশি দেখা যায়। গাছ আক্রান্ত হলে গাছের পাতা ক্রমান্বয়ে হলুদ রং ধারণ করে ও শুকিয়ে যায়। গাছ টান দিলে সহজেই উঠে আসে। মাটি ভেঁজা থাকলে গাছের গোড়ায় ছত্রাকের সাদা মাইসেলিয়াম ও সরিষার দানার ন্যায় স্কেলেরোসিয়াম (ছত্রাক গুটিকা) দেখা যায়। গোড়া পচা রোগ মসুর চাষের অন্যতম প্রধান সমস্যা। সাধারণত চারা গজানোর পর এ রোগের আক্রমণে হঠাৎ করে চারা গাছ নেতিয়ে পড়ে মারা যায় ও শুকিয়ে খড়ের রং ধারণ করে। এটি মাটি বাহিত ছত্রাকজনিত রোগ। বীজশোধক ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করে লাগালে গোড়া পচা রোগ দমন করা যায়। এছাড়াও মাঠে দেখা দিলে কার্বেনডাজিম (ব্যভিস্টিন ডিএফ অথবা নোইন) + প্রোভেক্স-২০০ ডব্লিউ পি এদের প্রতিটি ১ গ্রাম হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বিকালে গাছের গোড়ায় ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।

স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট (পাতা ঝলসানো)

বর্তমানে মসুর চাষে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হল ষ্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট (পাতা ঝলসানো) রোগ যার ফলে শতকরা ৮০ ভাগ ফলন কমে যেতে পারে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে সমগ্র ফসলের মাঠটিই ঝলসে যায়। বারি মসুর-৯ জাতটি সাধারণত স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ আসার পূর্বেই পরিপক্ক অবস্থায় চলে আসে। তবে মাঠে রোগ সংক্রমণের সাথে সাথেই গাছে ফল ধরা শুরু করলে প্রতিষেধক হিসেবে পর্যায়ক্রমিকভাবে ইপ্রোড্রিওন (রোভরাল-৫০ ডব্লিউ পি) ২ গ্রাম/লিটার ও ফেনামিডিওন + মেনকোজেব গ্রুপের (সিকিউর- ৬০০ ডব্লিউ জি) ১ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে অথবা ফলিকুর (টেবুকোনাজল) ১ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

মসুরের মাঠে তেমন পোকার আক্রমণ হয় না, তবে জাবপোকা দেখা যেতে পারে। জাবপোকা সাধারণত মসুরের পাতা ডগা, ফুল ও ফল থেকে রস চুষে খায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে গাছ খর্বাকৃতির হয়, ফুল ও ফলের সংখ্যা কমে যায় এবং বীজ ছোট হয়ে যায়। মারাত্মক আক্রমণে ডাইমেথয়েট (যেমন- টাফগর-৪০ ইসি) প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ, মাড়াই ও সংরক্ষণ

বীজ বপনের ৮৫-৯০ দিন পর মসুর সংগ্রহ করা যায়। মসুরের ফল পেকে গাছ শুকিয়ে গেলে গাছগুলোকে কেটে শক্ত মাটিতে বা মাটির উপরে পলিথিন বিছিয়ে অথবা পাকা মেঝেতে ছড়িয়ে রেখে শুকাতে হবে। ফল পাকার সঙ্গে সঙ্গে গাছও শুকিয়ে যায়। ফলসহ গাছের গোড়া কেটে এনে ভালভাবে রৌদ্রে শুকিয়ে, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গরু ঘুরিয়ে অন্যান্য ফসলের মত অতি সহজেই মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করা যায়। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন অবস্থাতেই ভেজা গাছ গাদা করে রাখা না হয়। তাতে বীজ নষ্ট হয়ে যায়। সকালের দিকে ফসল সংগ্রহের উপযুক্ত সময় কারণ এই সময় কুয়াশা দ্বারা ফল ভিজে নরম হয়, যার ফলে ফল ফেটে বীজ ঝরে পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে। বীজ সংগ্রহ করার পর রৌদ্রে শুকিয়ে বীজ ৮-৯% আর্দ্রতায় (যাতে দাঁত দিয়ে কাটলে কট্ কট্ শব্দ হয়) বায়ু নিরোধ পাত্রে (ধাতব বা প্লাস্টিক ড্রাম, পলিথিনযুক্ত বস্তা ইত্যাদি) গুদামজাত করতে হবে। গুদামজাতকালে শুসরী পোকা থেকে সুনিশ্চিত সুরক্ষার জন্য প্রতি ৫০-১০০ কেজি পাত্রের জন্য ১টি করে এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড বড়ি (ফসটক্সিন বা অন্য নামের) সুতি কাপড়ের ন্যাকড়ার পুটলীতে বেধে বস্তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এভাবে ফসটক্সিন ট্যাবলেট ব্যবহার করে ডালের শুঁসড়ী পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

খেসারীর জাত

বারি খেসারী-৫

গাছ লম্বা আকৃতির (৭০-৮০ সেমি) এবং অধিক বায়োমাস বিশিষ্ট। এর ফুল বড় এবং গাঢ় নীল, বীজ মসৃণ ও ধূসর বর্ণের এবং এ জাতটি গোড়া পচা এবং ডাউনি মিলডিউ রোগ সহনশীল। গাছে ফলের সংখ্যা বেশি (৩০-৪৯ টি) ও তুলনামূলক বড় আকৃতির বীজ (১০০ বীজের ওজন ৫.৩-৫.৮ গ্রাম)। জীবনকাল ১২১-১২৫

বারি খেসারী-৫

দিন। গড় বীজের ফলন-১.৪৭-১.৭০ টন/হেক্টর। তবে অনুকূল আবহাওয়া ও যথাযথ যত্ন নিলে ফলন হেক্টরপ্রতি ২ টনের অধিক হতে পারে। ODAP এর পরিমাণ খুব কম (০.০৪%)।

শস্য পরিক্রমা

খেসারী সাধারণত একক এবং সাথী উভয় ফসল হিসেবে চাষাবাদ করা সম্ভব। ডাল চাষের আওতাধীন প্রায় সকল শ্রেণির জমিতেই খেসারী চাষাবাদ করা সম্ভব। বাংলাদেশে আমন ধানের সাথে রিলে ফসল হিসাবে খেসারীর চাষ বহুল প্রচলিত। শস্য পরিক্রমায় রবি মৌসুমে খেসারীর আবাদ করা হয়ে থাকে। প্রস্তাবিত বারি খেসারী-৫ জাতটি "বোনা আমন/রোপা আমন-খেসারী একক/খেসারী রিলে-পাট/তিল/আউশ" শস্য পরিক্রমায় চাষ করার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটির প্রকৃতি ও জমি তৈরি

সব ধরনের মাটিতেই চাষ করা সম্ভব। তবে সু-নিষ্কাশিত এঁটেল দোআঁশ, পলি বা পলি দোআঁশ এবং রসযুক্ত পলি মাটি খেসারী চাষের উপযোগী। আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসাবে চাষের জন্য আমন ধান কাটার ১০-১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে জমিতে বীজ ছিটিয়ে দিলেই চলে। একক ফসল হিসাবে চাষের জন্য জমিতে জো আসার পর ২/৩ টি আড়াআড়ি চাষ এবং মই দিয়ে জমি তৈরি করে নিতে হয়। জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে সেচ দিয়ে 'জোঁ' আসার পর চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। জমি তৈরির সময় বড় ঢেলা থাকলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ

সাথী ফসল হিসাবে চাষের ক্ষেত্রে তেমন কোন সারের প্রয়োজন হয় না। একক ফসল হিসাবে চাষাবাদের জন্য জমিতে হেক্টরপ্রতি ৩০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি টিএসপি ও ৩৫ কেজি এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। সম্পূর্ণ সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

বপনের সময়

খেসারী সময়মতো বপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কার্তিক মাসের দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। বীজ বপনে দেরি হলে অর্থাৎ কার্তিক মাসের শেষ বা তার পরে বীজ বপন করলে ডাউনি মিলডিউ রোগ এবং জাব

পোকার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। জমিতে পরিমাণ মতো আর্দ্রতা না থাকলে দানা ঠিকমত পুষ্ট হতে পারে না যা ফলনের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। আমন ধানের সাথে রিলে হিসেবে চাষের জন্য ধান কাট

বীজের পরিমাণ

সাথী ফসল হিসাবে বীজ বপন করলে বীজের পরিমাণ কিছুটা বেশি প্রয়োজন হয়। সাথী ফসলের জন্য হেক্টরপ্রতি ৬০-৬৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। একক ফসল হিসাবে সারিতে বপন করলে ৪৫-৫০ কেজি এবং ছিটিয়ে বপন করলে ৫০-৫৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। একক ফসল হিসাবে সারিতে বপন করলে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০ সেমি রেখে ৩-৪ সেমি গভীরে বীজ সারিতে বপন করতে হবে। বীজ বপনের পরে হালকা মই দিয়ে বীজ ঢেঁকে দিতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

জমিতে আগাছার প্রকোপ বেশি হলে বপনের ৩০-৪০ দিনের মধ্যে একবার হাত দ্বারা আগাছা দমন করতে হবে। তবে ফুল আসার পূর্ব পর্যন্ত আগাছা নিয়ন্ত্রণ রাখা ভালো। রবি মৌসুমে এলাকাভিত্তিক কিছু কিছু আগাছা যেমন- মোথা, কাঁটা জাতীয় আগাছা, বথুয়া ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব দেখা গেলে সেগুলো পরিষ্কার করে দেয়া উত্তম। এক্ষেত্রে সারিতে বপন করলে আগাছা নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।

রোগ ও পোকামাকড় দমন

খেসারীতে সাধারণত রোগ ও পোকামাকড়ের উপদ্রব খুব কম হয়ে থাকে। দুটি ছত্রাকজনিত রোগ, গোড়া পচা এবং ডাউনি মিলডিউ খেসারীর প্রধান রোগ। সময়মত বীজ বপন এবং শষ্যপর্যায় অবলম্বন করে এই রোগের আক্রমণ এড়ানো যায়। প্রোভেক্স ২ মিলি/কেজি দ্বারা বীজ শোধন করে লাগালে গোড়া পচা রোগ নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব। ডাউনি মিলডিউ রোগ দমনের জন্য টিল্ট ২৫০ ইসি (০.৫%) বা থিওভিট ৮০ ডব্লিউপি (০.২%) হারে পানিতে মিশিয়ে রোগের আক্রমণের শুরু থেকে ৭ হতে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করলে এই রোগ দমন করা যায়। খেসারীতে মাঝে মাঝে জাব পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে ডাইমেথয়েট গ্রুপের যেমন: টাফগর ৪০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি লিটার ঔষধ মিশিয়ে ব্যবহার করলে এই পোকা দমন করা যায়। এছাড়া সংরক্ষণাগারে শুসরী পোকার আক্রমণ থেকে বীজকে রক্ষা করতে হলে বীজ ভালো করে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। বীজের পরিমাণ বেশি হলে ফসটক্সিন ট্যাবলেট দিয়ে এ পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রতি ১০০ কেজি বীজের জন্য ১/২টি ফসটক্সিন ট্যাবলেটের প্রয়োজন হয়।

শিমের জাত

বারি শিম-৯ (খাইস্যা)

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যঃ এটি একটি উচ্চফলনশীল দেশি শিমের জাত। এটি শীতকালীন ফসল। সেপ্টেম্বর মাস বীজ বপনের জন্য উপযুক্ত সময়। কাণ্ড সরু, নলাকার ও সবুজ বর্ণের। প্রধান কাণ্ড কিছুটা দীর্ঘ হওয়ার পরই শাখা- প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কাণ্ডে কোন আকর্ষী নেই তাই বাউনী পেচিয়ে উপরের দিকে উঠে। পাতা ত্রিপত্রকী যৌগিক। পাতার বোঁটার গোড়া স্ফীত (pulvinous), ডিম্বাকার পত্রকের অগ্রভাগ সূক্ষ্মায়িত।

পাতার কক্ষে রেশিম জাতীয় পুষ্পমঞ্জুরী উৎপন্ন হয়। ফুল সাদা এবং পাপড়ি মেলার ২-৩ দিন পর ফুল ঝরে পড়ে। সাধারণত নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ফুল ধরা শুরু করে তিন মাসাধিক কাল গাছে ফুল থাকে। শিমের শুঁটি চ্যাপ্টা, দৈর্ঘ্যে ৮.৮-৮.৯ সে.মি. ও প্রস্থে ২.০৩-২.২৩ সে.মি. এবং হালকা সবুজ বর্ণের। প্রধান বৈশিষ্ট্য এর বড় ও পুষ্ট বীজ। সাধারণত অন্যান্য শিমের ১০০ টি বীজের ওজন ৫০-৭৫ গ্রাম। সেখানে এই শিমের ১০০ টি বীজের ওজন গড়ে ১৩০ গ্রামের বেশি। যা অন্যান্য দেশি শিমের জাত থেকে একে পৃথক করেছে। হেক্টরপ্রতি শিমের ফলন ১৫.৫-১৬.২ টন এবং বীজের ফলন ৭.৩-৯.৫ টন। শিম সংগ্রহের সময় মূলত জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস।

বারি শিম-৯

পোকামাকড় ও রোগবালাইঃ জাতটিতে পোকামাকড় ও রোগ-বালাইয়ের আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম। শিমের সাধারণ পোকামাকড় ও রোগ-বালাইয়ের (জাবপোকা, ফলছিদ্রকারী পোকা, মোজাইক, পাতায় দাগ পড়া এবং এনথ্রাকনোজ) এর মধ্যে জাব পোকা ও এনথ্রাকনোজ এর হালকা আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। কীটনাশক ইমিডাক্লোরোপ্রিড প্রতি লিটার পানিতে ১ মি. লি. অথবা ডাইমেথোরেট (২ মি.লি.) এবং ছত্রাকনাশক কার্বেন্ডাজিম ৫০ ডব্লিউপি (১ মি.লি) বা প্রোপিকোনাজল (০.৫ মি. লি) হারে ১০ দিন অন্তর ৩ বার স্পেরে করে এসব রোগবালাই এর উপদ্রব হ্রাস করা যায়।

বারি শিম-১০ (খাইস্যা)

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যঃ এটি একটি উচ্চফলনশীল দেশি শিমের জাত। এটি শীতকালীন ফসল। সেপ্টেম্বর মাস বীজ বপনের জন্য উপযুক্ত সময়। কাণ্ড সরু, নলাকার ও সবুজ বর্ণের। প্রধান কাণ্ড কিছুটা দীর্ঘ হওয়ার পরই শাখা- প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কাণ্ডে কোন আকর্ষী নেই তাই বাউনী পেচিয়ে উপরের দিকে উঠে। পাতা ত্রিপত্রকী যৌগিক। পাতার বোঁটার গোড়া স্ফীত (pulvinous), ডিম্বাকার পত্রকের অগ্রভাগ সূক্ষ্মায়িত।

পাতার কক্ষে রেশিম জাতীয় পুষ্পমঞ্জুরী উৎপন্ন হয়। ফুল সাদা এবং পাপড়ি মেলার ২-৩ দিন পর ফুল ঝরে পড়ে। সাধারণত নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফুল ধরা শুরু করে আড়াই মাসাধিক কাল গাছে ফুল থাকে। শিমের শুঁটি লম্বা এবং মাথার দিকে সুচালো, দৈর্ঘ্যে ১১.২-১১.৪ সে.মি. ও প্রস্থে ১.৯৫-২.২২ সে.মি. এবং গাঢ় সবুজ বর্ণের। প্রধান বৈশিষ্ট্য এর বড় ও পুষ্ট বীজ। সাধারণত অন্যান্য শিমের ১০০ টি বীজের ওজন ৫০-৭৫ গ্রাম। সেখানে এই শিমের ১০০ টি বীজের ওজন গড়ে ১৩০ গ্রামের বেশি। বীজের আকর্ষণীয় রঙের কারণে এর ভোক্তা চাহিদা বেশি এবং বাজার মূল্যও অধিক যা অন্যান্য দেশি শিমের জাত থেকে একে পৃথক করেছে। হেক্টরপ্রতি শিমের ফলন ১২.৬-১৫.৫ টন এবং বীজের ফলন ৫.৫-৮.৫ টন। শিম সংগ্রহের সময় মূলত জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি মাস।

বারি শিম-১০

পোকামাকড় ও রোগবালাইঃ প্রস্তাবিত জাতটিতে পোকামাকড় ও রোগ-বালাইয়ের আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম। শিমের সাধারণ পোকামাকড় ও রোগ-বালাইয়ের (জাবপোকা, ফলছিদ্রকারী পোকা, মোজাইক, পাতায় দাগ পড়া এবং এনথ্রাকনোজ) এর মধ্যে জাব পোকা ও এনথ্রাকনোজ এর হালকা আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। কীটনাশক ইমিডাক্লোরোপ্রিড প্রতি লিটার পানিতে ১ মি. লি. অথবা ডাইমেথোরেট (২ মি.লি.) এবং ছত্রাকনাশক কার্বেন্ডাজিম ৫০ ডব্লিউপি (১ মি.লি) বা প্রোপিকোনাজল (০.৫ মি. লি) হারে ১০ দিন অন্তর ৩ বার স্পেরে করে এসব রোগবালাই এর উপদ্রব হ্রাস করা যায়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও জলবায়ুঃ সব ধরনের মাটিতেই শিম জন্মে। তবে সুনিষ্কাশিত দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি ভাল ফলনের জন্য উপযুক্ত। ফসলের অঙ্গজ বৃদ্ধি ও প্রজনন পর্যায়ের জন্য তাপমাত্রা ও দিবস দৈর্ঘ্য যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এ সবজির অঙ্গজ বৃদ্ধির জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এবং দীর্ঘ দিবস প্রয়োজন। আবার প্রজনন ধাপের জন্য নিম্ন তাপমাত্রাসহ জলবায়ুর সাথে হ্রস্ব দিবস প্রয়োজন। লক্ষ্য করা যায় যে, শিম যখনই বপন করা হউক না কেন শীতের প্রভাব না পড়লে পুষ্পায়ন ঘটে না। তবে গ্রীষ্মকালীন জাতটি তাপ ও দিবস নিরপেক্ষ হওয়ায় বছরের যে কোন সময় বপন/রোপণ করলে পুষ্পায়ন ঘটে।

জীবনকাল : আগাম জাত : ১৩০- ১৬০ দিন (বীজ সংগ্রহ পর্যন্ত)।

নাবী জাতঃ ১৫০- ২০০ দিন (বীজ সংগ্রহ পর্যন্ত)।

বীজ বপনের সময় : আষাঢ় মাসের মাঝামাঝী থেকে বীজ বপন করা যেতে পারে। তবে আগাম ফসলের জন্য জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝী থেকে আষাঢ়ের মাঝামাঝী (জুন মাস) বীজ বপন করা উত্তম। গ্রীষ্মকালীন জাতটি বছরের যে কোন সময় বপন করা যায়। বপনের সময় দূরত্ব এবং বপন পদ্ধতির উপর বীজের হার নির্ভর করে।

বীজের হারঃ প্রতি হেক্টরে ৭.৫ কেজি, একরে ৩.০ কেজি এবং শতকে ৩০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন।

জমি তৈরিঃ জমি ৪-৫টি চাষ দিয়ে ঢেলা ভেঙ্গে খুব পরিপাটি করে তৈরি করতে হয়। এর পর সমতল জমিতে সঠিক দূরত্বে উঁচু মাদা তৈরি করে বীজ বপন বা চারা রোপণ করা যায়। তবে সেচ ও পানি নিকাশের সুবিধা এবং পরবর্তী পরিচর্যার সুবিধার জন্য মিড়ি তৈরি করে মিড়িতে বীজ বপন করা সবচেয়ে ভাল। মিড়ি ১৫ থেকে ২৫ সেমি উঁচু এবং ২.৫ মিটার প্রশস্ত হবে। জমির প্রকৃতি এবং কাজের সুবিধা বিবেচনা করে মিড়ির দৈর্ঘ্য ঠিক করতে হয়। সেচ ও পানি নিকাশের সুবিধার জন্য পাশাপাশি দুটি মিড়ির মাঝখানে ৫০ সেমি প্রশস্ত ১৫ থেকে ২৫ সেমি গভীর পিলি রাখতে হয়। ২.৫ মিটার প্রশস্ত মিড়ির উভয় পার্শ্বে ৫০ সেমি করে বাদ দিয়ে ১.৫ মিটার দূরত্বে মিড়ির লম্বালম্বি দু'টি লাইন টেনে নিতে হবে। মিড়ির ২ লাইন বা সারিতে ১.৫ মিটার দূরে দূরে ৩০×৩০×৩০ সেমি সাইজের মাদাতে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করে তৈরি করে ফেলতে হবে। এতে সারি থেকে সারির দূরত্ব ১.৫ মিটার এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হল ১.৫ মিটার। তাছাড়া ২টি মিড়ির মধ্যে ৫০ সেমি প্রশস্ত পিলি থাকায় পাশাপাশি দু'টি মিড়ির নিকটতম সারি দুটির দূরত্ব হল ১.৫ মিটার। তবে আজকাল ১ মিটার প্রস্থ বেডে ও একক সারি পদ্ধতিতে ১.০-১.৫ মিটার দূরত্বে বীজ বপন/চারা রোপণ করা

যায়। উভয় পদ্ধতিতে একক আয়তনের জমিতে সমসংখ্যক গাছ সংকুলান হয়। তবে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে গাছের পরিচর্যা ও ফসল উত্তোলন কার্যক্রম পরিচালনা সুবিধাজনক।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: শিম ডাল জাতীয় শস্য। এতে সারের পরিমাণ বিশেষ করে নাইট্রোজেন সারের পরিমাণ কম লাগে।

শিম চাষে হেক্টরপ্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি।

সারের নাম	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	বপন/চারা রোপণের সময় গর্তে প্রয়োগ	গর্তে উপরি প্রয়োগ (বপনের/ রোপণের ৩০ দিন পর)
গোবর	১০ টন	সব	-	-
ইউরিয়া	২৫ কেজি	-	১২.৫	১২.৫
টিএসপি	৯০ কেজি	-	সব	-
এম ও পি	৬০ কেজি	-	৩০	৩০
জিপসাম (সালফার সার)	৫ কেজি	সব	-	-
বোরিক এসিড (বোরন সার)	৫ কেজি	সব	-	-

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর সার এবং জিপসাম ও বরিক এসিড সবটুকু ছিটিয়ে জমিতে প্রয়োগ করে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বীজ বপন বা চারা রোপণের ৪-৫ দিন আগেই ইউরিয়া ও এমপি (পটাশ) সারের অর্ধেক এবং টিএসপি সারের সবটুকু একত্রে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাদার মাটির সাথে (১০ সে.মি. গভীর পর্যন্ত) কোদালের দ্বারা হালকাভাবে কুপিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বপন/রোপণের ৩০ দিন পর বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার মাদায় উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

- বপনকৃত বীজ থেকে চারা বের হওয়ার পর ৮-১০ দিনের মধ্যেই প্রতিটি মাদায় একটি সুস্থ সবল চারা রেখে বাকিগুলি উঠিয়ে ফেলতে হবে।
- দেশি শিমের ক্ষেত সর্বদা আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

- গাছ ২৫-৩০ সেমি উঁচু হলেই বাউনী দিতে হবে এবং মাচা তৈরি করে শিম গাছকে তুলে দিতে হবে। তবে চারা গাছ মাচায় উঠা পর্যন্ত গোড়ার দিকে যেন না পেচাতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গোড়া পেচাতে (Coiling) না দিলে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন প্রায় ১০-১৫% বেশি হয়।
- মাটির রস যাচাই করে ১০-১৫ দিন পর সেচ দিতে হবে।
- পুরাতন পাতা ও ফুল বিহীন ডগা/শাখা কেটে ফেলতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন: জাতভেদে বীজ বপনের ৯৫-১৪৫ দিন পর শিমের শুঁটি (পড) গাছ থেকে তুলে বাজারজাত করা যেতে পারে। ফুল ফোঁটার ২৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে শিম তোলার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। ৫-৭ দিন অন্তর অন্তর গাছ থেকে শিম তুললে মোট ১৩-১৪ বার গুণগত মানসম্পনড়ব শুঁটি (পড) সংগ্রহ করা যায় এবং এতে হেক্টরপ্রতি প্রায় ১৫-২০ টন শিম পাওয়া যায়।

লেবুর জাত

বারি কাগজী লেবু-১

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- সারা বছর ফল প্রদানকারী জাত
- গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা: ৭৮০
- ফলের গড় ওজন: ৮২ গ্রাম
- ভিটামিন সি: ৬৫ মিলি. গ্রাম/১০০ গ্রাম
- ক্যাঙ্কারসহ অন্যান্য রোগ ও পোকামাকড় সহিষ্ণু
- খরা এবং তাপ সহিষ্ণু

বারি কাগজী লেবু-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

কাগজী লেবু (*Citrus aurantifolia* Swingle) একটি জনপ্রিয় লেবু জাতীয় ফল। এটি Rutaceae পরিবারভুক্ত একটি চিরহরিৎ দ্রুতবর্ধনশীল গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। স্বাদ, গন্ধ, পুষ্টিমান এবং ঔষধি গুণাগুণের ভিত্তিতে লেবু জাতীয় ফলের মধ্যে কাগজী লেবু অন্যতম। কাগজী লেবু প্রধানত ভিটামি সি, ক্যালসিয়াম এবং আয়রন সমৃদ্ধ। গরমের দিনে তৃষ্ণা নিবারনের ক্ষেত্রে কাগজী লেবুর 'সরবত' অদ্বিতীয় পানীয়। বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকায় এর কাগজী লেবুর চাষ হলেও পাহাড়ী এলাকাসহ রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, যশোর ও চট্টগ্রাম জেলায় এই লেবু বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হয়। যেহেতু সারা বছরব্যাপী উৎপাদিত হয় এবং এই লেবুর অত্যাধিক চাহিদা সুতরাং কাগজী লেবু এদেশে একটি সম্ভাবনাময় ফসল হিসাবে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে।

জলবায়ু ও মাটি

কাগজী লেবু উষ্ণ ও অবগ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের ফসল। সাধারণত উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে কাগজী লেবু ভাল জন্মে। গভীর দোআঁশ মাটি কাগজী লেবু চাষের জন্য সর্বোত্তম। তবে কাগজী লেবু গাছ রোদ্রোজ্জ্বল পরিবেশে ও সুনিকাশ সম্পন্ন মধ্যম অম্লীয় মাটিতে ভাল হয়। এটি পাহাড়ী এলাকাসহ বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য। অতিরিক্ত আর্দ্র পরিবেশ কাগজী লেবুর জন্য ক্ষতিকর। সাধারণভাবে ২৫° থেকে ৩০° সে. তাপমাত্রায় এটির দৈহিক বৃদ্ধি সবচেয়ে ভাল হয়, ১৩° সে., এর নিচে এবং ৪০° সে. এর উপরে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন ব্যাহত হয়।

জমিনির্বাচন ও তৈরি

রোদযুক্ত সুনিষ্কাশিত উঁচু জমি অথবা পুকুর, রাস্তা বা পাহাড়ের ঢাল লেবু চাষের জন্য উত্তম। বাণিজ্যিকভাবে চাষ করতে হলে জমি গভীর ভাবে চাষ দিয়ে আগাছা ভাল ভাবে পরিষ্কার করে জমি তৈরি করতে হয়। পাহাড়ী ঢালু জমিতে ঢালের অবস্থান বুঝে আগাছা পরিষ্কার করার পর নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত করে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করতে হবে। এখানে সমতল ভূমির মতো জমি চাষ দেয়ার প্রয়োজন নেই। চারা রোপণ করার ১৫-২০ দিন পূর্বে ৩ মিটার × ৩ মিটার দূরত্বে ৮০ সে.মি. × ৮০ সে.মি. × ৮০ সে.মি. আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১৫-২০ কেজি গোবর অথবা জৈব সার, ৩০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি, ২০০ গ্রাম জিপসাম ও ৩০ গ্রাম বোরণ সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে। তবে মাটি অধিক অম্লীয় হলে হেক্টরপ্রতি ১ টন অথবা গর্ত

প্রতি ১.৫ কেজি ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে। উল্লিখিত রোপণ দূরত্ব হিসাবে প্রতি হেক্টর জমিতে প্রায় ১১০০ টি চারা দরকার।

রোপণ পদ্ধতি ও রোপণ সময়

কাগজী লেবুর চারা সারি করে বা বর্গাকার প্রণালীতে লাগালে বাগানে আন্তঃপরিচর্যা ও ফল সংগ্রহ সহজ হয়। পাহাড়ী ঢালু জমিতে ঢালের আড়াআড়ি সারি করে চারা লাগালে মাটি ক্ষয় কম হয়। জুন থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত চারা লাগানোর উত্তম সময় তবে সেচ সুবিধা থাকেলে সারা বছর চারা লাগানো যায়।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা

মাদা তৈরি করার ১৫-২০ দিন পর চারা বা কলম লাগাতে হয়। চারা গর্তের ঠিক মাঝখানে খাড়াভাবে লাগাতে হবে এবং চারার চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হয়। তারপর চারাটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে এবং চারার গোড়ায় ঝাঝড়ি দিয়ে পানি দিতে হবে। প্রয়োজনে প্রতিটি চারায় পৃথকভাবে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ

চারা লাগানোর পর ভাল ফলন পেতে হলে নিয়মিতভাবে সময়মতো সার প্রয়োগ করতে হবে। নিম্নে বয়স অনুপাতে গাছ প্রতি সারের পরিমাণ দেওয়া হল।

গাছের বয়স (বছর)	সারের নাম ও পরিমাণ						
	পচা গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	জিপসাম (গ্রাম)	জিংক সালফেট (গ্রাম)	বোরণ সার (গ্রাম)
১-২	১৫	২০০	২০০	২০০	২০	৫	৫
৩-৫	২০	৪০০	৩০০	৩০০	৫০	৮	১০
৬ এবং তদুর্দ্ধ	২৫	৫০০	৪০০	৪০০	৭০	১০	১৫

উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে গাছের গোড়া হতে ষাট সে.মি. দূরে ছিটিয়ে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। পাহাড়ের ঢালে **সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে** ডিবলিং পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। প্রথম কিস্তি মাঘ-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) মাসে যখন ফল ধরা শুরু হয়, দ্বিতীয় কিস্তি বর্ষার প্রারম্ভে

বৈশাখ থেকে জ্যৈষ্ঠ (মে-জুন) মাসে, এবং তৃতীয় কিস্তি মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সার প্রয়োগের পর পরই একটু হালকা পানি সেচ দিতে হবে যাতে করে সার মাটির সাথে মিশে যেতে পারে।

আগাছা দমন

গাছের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য সবসময় জমি পরিষ্কার বা আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বিশেষ করে গাছের গোড়া থেকে চারদিকে ১ মিটার পর্যন্ত জায়গা সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

পানি ও সেচ নিষ্কাশন

চারা রোপণের পর ঝরণা দ্বারা বেশ কিছু দিন পর্যন্ত পানি সেচ দিতে হবে। সর্বোচ্চ ফলনের জন্য ফুল আসা ও ফলের বিকাশের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক। এ জন্য খরা মৌসুমে কাগজী লেবু বাগানে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে সেজন্য বৃষ্টি ও সেচের অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ

গাছের গোড়ার দিকে জল-শোষক শাখা বের হলেই কেটে ফেলতে হবে। এছাড়া গাছের ভিতরের দিকে যে সব ডালাপালা সুর্যালোক পায়না সেসব দুর্বল ও রোগাক্রান্ত শাখা প্রশাখা নিয়মিত ছাটাইকরে দিতে হবে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস ছাঁটাই করার উপযুক্ত সময়। ছাঁটাই করার পর কর্তিত স্থানে বর্দো পেস্টের প্রলেপ দিতে হবে যাতে ছত্রাক আক্রমণ করতে না পারে।

ফল সংগ্রহ ও সংগ্রোহত্তর পরিচর্যা

সারা বছরই কাগজী লেবু উৎপন্ন হয় তবে কাগজী লেবুর ফুল আসার প্রধান মৌসুম হল জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি মাস এবং তা থেকে এপ্রিল হতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ফল আহরণ করা হয়। আবার অনেক সময় জুন-জুলাই মাসেও কিছু ফুল আসে এবং তা থেকে সেপ্টেম্বর হতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। ফলের ত্বক তুলনামূলকভাবে মসৃণ ও ফলের রং গাঢ় সবুজ হতে কিছুটা হালকা হয়ে আসলে ফল সংগ্রহ করতে হবে। ফল সংগ্রহ করার পর প্রথমে বাছাইএর মাধ্যমে ভাল ও ত্রুটিপূর্ণ (বাজারজাতকরণের অনুপযোগী) ফলগুলো আলাদা করা হয়। তারপর ভাল ফলগুলো গ্রেডিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সাইজ অনুপাতে ভাগ করে বাজারজাত করা হয়।

বারি লেবু-৪

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- সারা বছর ফল প্রদানকারী বীজ বিহীন জাত
- গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা: ১১৭৫
- ফলের গড় ওজন: ৮৩ গ্রাম
- ভিটামিন সি: ৩৩ মিলি. গ্রাম/১০০ গ্রাম
- ক্যাঙ্কারসহ অন্যান্য রোগ ও পোকামাকড় সহিষ্ণু
- খরা, তাপ ও স্বল্পকালীন বন্যা সহিষ্ণু

বারি লেবু-৪

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি

লেবু সাধারণত উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু পছন্দ করে। আর্দ্র পরিবেশে লেবুতে নানা রকম রোগ সৃষ্টি হয় ও পোকা মাকড়ের উপদ্রব বেড়ে যায়। সাধারণভাবে ২৫° থেকে ৩০° সে. তাপমাত্রায় এদেব দৈহিক বৃদ্ধি সবচেয়ে ভাল হয়, ১৩° সে., এর নিচে এবং ৪০° সে. এর উপরে গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। সব ধরনের মাটিতে জন্মিলেও সুনিষ্কাশিত, উর্বর, মধ্যম থেকে হাল্কা দোআঁশ মাটি লেবু চাষের জন্য উত্তম। পাহাড়ী ও সমতল উভয় এলাকাতেই লেবু জন্মে।

জমি নির্বাচন ও তৈরি

রোদযুক্ত সুনিষ্কাশিত উর্বর উঁচু বা মাঝারী উচু জমি যেখানে বৃষ্টির পানি জমে না বা পাহাড়ের ঢালু জমি মাল্টা চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। জমি সমতল হলে পর্যায়ক্রমিক চাষ ও মই দিয়ে সমান করে নিতে হবে। জমি থেকে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। পাহাড়ী ঢালু জমিতে ঢালের অবস্থান বুঝে আগাছা পরিষ্কার করার পর

নির্দিষ্ট দুরত্বে গর্ত করে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করতে হবে। এখানে সমতল ভূমির মতো জমি চাষ দেয়ার প্রয়োজন নেই। চারা রোপণ করার ১৫-২০ দিন পূর্বে ৩ মিটার দূরত্বে ৬০ সে.মি. × ৬০ সে.মি. × ৬০ সে.মি. আকারের গর্ত করতে হবে। এই হিসাবে প্রতি হেক্টর জমিতে প্রায় ১৬০০ টি চারা দরকার হয়। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১৫-২০ কেজি গোবর অথবা জৈব সার, ২০০ গ্রাম টিএসপি, ২০০ গ্রাম এমওপি, ১৫০ গ্রাম জিপসাম ও ৩০ গ্রাম বোরণ সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি ও সময়

সমতল ভূমিতে লেবুর চারা/কলম সারি করে বাবর্গাকার প্রণালীতে লাগালে বাগানে আন্ত-পরিচর্যা ও ফল সংগ্রহ সহজ হয়। তবে পাহাড়ী এলাকায় ঢালু জমিতে ঢালের আড়াআড়ি ভাবে সারি করে বা কন্টুর পদ্ধতিতে চারা/কলম রোপণ করা হয়। সাধারণত মধ্য বৈশাখ থেকে মধ্য ভাদ্র (মে-আগস্ট) মাসের মধ্যে লেবুর চারা/কলম লাগানো উত্তম। তবে পানি সেচ নিশ্চিত করা গেলে বছরের অন্যান্য সময়ও চারা লাগানো যায়। রোপণের পরপর খুঁটি দিয়ে চারা/কলমটি খুঁটির সাথে বেধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমত পানি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ

চার লাগানোর পর ভাল ফলন পেতে হলে নিয়মিতভাবে সময়মতো সার প্রয়োগ করতে হবে। নিম্নে বয়স অনুপাতে গাছ প্রতি সারের পরিমাণ দেওয়া হল।

গাছের বয়স (বছর)	সারের নাম ও পরিমাণ			
	পচা গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-২	১৫	২০০	২০০	২০০
৩-৫	২০	৪০০	৩০০	৩০০
৬ এবং তদুর্দ্ধ	২৫	৫০০	৪০০	৪০০

উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে গাছের গোড়া হতে ৬০ সে.মি. দূরে চারিদিকে ছিটিয়ে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। পাহাড়ের ঢালে ডিবলিং পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। প্রথম কিস্তি মাঘ-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) মাসে যখন ফল ধরা শুরু হয়, দ্বিতীয় কিস্তি বর্ষার প্রারম্ভে বৈশাখ থেকে জ্যৈষ্ঠ (মে-জুন) মাসে, এবং তৃতীয় কিস্তি মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য কার্তিক

(সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সার প্রয়োগের পর পরই একটু হালকা পানি সেচ দিতে হবে যাতে করে সার মাটির সাথে মিশে যেতে পারে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ছকে দেয়া পরিমাণ অনুযায়ি সার প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা দমন

গাছের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য সবসময় জমি পরিষ্কার বা আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বিশেষ করে গাছের গোড়া থেকে চারদিকে ১ মিটার পর্যন্ত জায়গা সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

পানি ও সেচ নিষ্কাশন

চারা রোপণের পর ঝরণা দ্বারা বেশ কিছু দিন পর্যন্ত সেচ দিতে হয়। সর্বোচ্চ ফলনের জন্য ফুল আসা ও ফলের বিকাশের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক। এ জন্য খরা মৌসুমে লেবু বাগানে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে সেজন্য বৃষ্টি ও সেচের অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ

গাছের গোড়ার দিকে জল-শোষক শাখা বের হলেই কেটে ফেলতে হবে। এছাড়া গাছের ভিতরের দিকে যে সব ডালাপালা সুর্যালোক পায়না সেসব দুর্বল ও রোগাক্রান্ত শাখা প্রশাখা নিয়মিত ছাটাইকরে দিতে হবে। শীতকাল ছাঁটাই করার উপযুক্ত সময়। ছাঁটাই করার পর কর্তিত স্থানে বর্দোপেস্টের প্রলেপ দিতে হবে যাতে ছত্রাক আক্রমণ করতে না পারে।

ফল সংগ্রহ ও সংগ্রোহত্তর পরিচর্যা

সারা বছরই লেবু উৎপন্ন হয় তবে লেবুর ফুল আসার প্রধান মৌসুম হল জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস এবং তা থেকে জুলাই -আগস্ট মাসে ফল আহরণ করা হয়। আবার অনেক সময় আগস্ট মাসেও কিছু ফুল আসে তা থেকে ডিসেম্বর- জানুয়ারি ফল আহরণ করা যায়। ফলের ত্বক তুলনামূলকভাবে মসৃণ ও ফলের রং কিছুটা হালকা হয়ে আসলে ফল সংগ্রহ করতে হবে। ফল সংগ্রহ করার পর প্রথমে সর্টিং এর মাধ্যমে ভাল ও ত্রুটিপূর্ণ (বাজারজাতকরনের অনুপযোগী) ফলগুলো আলাদা করা হয়। তারপর ভাল ফলগুলো গ্রেডিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সাইজ অনুপাতে ভাগ করে বাজারজাত করা হয়।

মাল্টার জাত

বারি মাল্টা-২

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- প্রতি বছর ফল প্রদানকারী জাত
- গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা: ১৩০
- ফলের গড় ওজন: ১৭৯ গ্রাম (বারি মাল্টা-১ এর চেয়ে বেশি)
- ভিটামিন সি: ৪৮ মিলি. গ্রাম/১০০ গ্রাম (বারি মাল্টা-১ এর চেয়ে বেশি)
- এসিডিটি: ০.২৯%
- ক্যাঙ্কারসহ অন্যান্য রোগ ও পোকামাকড় সহিষ্ণু
- ফল আহরণের সময়: সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর

বারি মাল্টা-২

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি

শুষ্ক ও উষ্ণ জলবায়ু মাল্টা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। বায়ুমণ্ডলের অধিক আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত মাল্টার ফলের গুণাগুণকে প্রভাবিত করে। শুষ্ক আবহাওয়ায় ফলের স্বাদ উন্নতমানের হয়। আর্দ্র জলবায়ুতে রোগ ও ক্ষতিকর পোকার উপদ্রব বেশি হয়। মাল্টা গাছ আলো পছন্দ করে এবং ছায়ায় গাছের বৃদ্ধি ও ফলের গুণগত মান কমে যায়। সব ধরনের মাটিতে জন্মিলেও সুনিষ্কাশিত, উর্বর, মধ্যম থেকে হাল্কা দোআঁশ মাটি মাল্টা চাষের জন্য উত্তম। মধ্যম অম্লীয় মাটিতে (pH ৫.৫-৬.৫) মাল্টা ভাল জন্মে। মাল্টা জলাবদ্ধতা মোটেও সহ্য করতে পারে না এবং উচ্চ মাত্রার লবণের প্রতি সংবেদনশীল।

জমি নির্বাচন ও তৈরি

রোদযুক্ত সুনিষ্কাশিত উর্বর উঁচু বা মাঝারী উচু জমি যেখানে বৃষ্টির পানি জমেনা বা পাহাড়ের ঢালু জমি মাল্টা চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। জমি সমতল হলে পর্যায়ক্রমিক চাষ ও মই দিয়ে সমান করে নিতে হবে। জমি থেকে আগাছা পরিষ্কার

করতে হবে। পাহাড়ী ঢালু জমিতে ঢালের অবস্থান বুঝে আগাছা পরিষ্কার করার পর নির্দিষ্ট দুরত্বে গর্ত করে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করতে হবে। এখানে সমতল ভূমির মতো জমি চাষ দেয়ার প্রয়োজন নেই। চারা রোপণ করার ১৫-২০ দিন পূর্বে ৪ মিটার দূরত্বে ৮০ সে.মি. × ৮০ সে.মি. × ৮০ সে.মি. আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১৫-২০ কেজি গোবর অথবা জৈব সার, ৩০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি, ২০০ গ্রাম জিপসাম ও ৩০ গ্রাম বোরণ সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি ও সময়

সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা ষড়ভূজী পদ্ধতিতে এবং পাহাড়ী এলাকায় কন্টুর পদ্ধতিতে চারা/কলম রোপণ করা হয়। সাধারণত মধ্য বৈশাখ থেকে মধ্য ভাদ্র (মে-আগস্ট) মাসের মধ্যে মাল্টা চারা লাগানো উত্তম তবে পানি সেচ নিশ্চিত করা গেলে বছরের অন্যান্য সময়ও চারা লাগানো যেতে পারে। রোপণের পরপর খুঁটি দিয়ে চারা/কলমটি খুটির সাথে বেধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমত পানি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ

ভাল ফলন পেতে হলে চারা লাগানোর পর নিয়মিতভাবে সময়মতো সার প্রয়োগ করতে হবে। সমান তিন কিস্তিতে গাছের গোড়া হতে ষাট সে.মি. দূরে ছিটিয়ে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। পাহাড়ের ঢালে সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ডিবলিং পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। প্রথম কিস্তি মাঘ-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) মাসে যখন ফল ধরা শুরু হয়, দ্বিতীয় কিস্তি বর্ষার প্রারম্ভে বৈশাখ থেকে জ্যৈষ্ঠ (মে-জুন) মাসে, এবং তৃতীয় কিস্তি মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সার প্রয়োগের পর পরই একটু হালকা পানি সেচ দিতে হবে যাতে করে সার মাটির সাথে মিশে যেতে পারে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ছকে দেয়া পরিমাণ অনুযায়ি সার প্রয়োগ করতে হবে ।

গাছের বয়স (বছর)	গোবর/ কম্পোস্ট (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমপি (গ্রাম)	জিংক সালফেট (গ্রাম)	বরিক এসিড (গ্রাম)	ডলোমাইট (কেজি)
১-৩	১০-১২	৫০০	৪০০	৩০০	১০	৫	২
৪-৬	১৫-২০	১০০০	৭৫০	৭৫০	২০	৮	৩
৭-৯	১৫-২০	১৫০০	৯০০	১০০০	২৫	১২	৪
১০ তদুর্দ্ধ	২০-২৫	২০০০	১৫০০	১৫০০	৩০	১৫	৪

আগাছা দমন

গাছের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য সবসময় জমি পরিষ্কার বা আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বিশেষ করে গাছের গোড়া থেকে চারদিকে ১ মিটার পর্যন্ত জায়গা সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

পানি ও সেচ নিষ্কাশন

চারা রোপণের পর ঝরণা দ্বারা বেশ কিছু দিন পর্যন্ত পানি সেচ দিতে হবে। সর্বোচ্চ ফলনের জন্য ফুল আসা ও ফলের বিকাশের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক। এ জন্য খরা মৌসুমে মাল্টা বাগানে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে সেজন্য বৃষ্টি ও সেচের অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ

গাছের গোড়ার দিকে জল-শোষক শাখা বের হলেই কেটে ফেলতে হবে। এছাড়া গাছের ভিতরের দিকে যে সব ডালাপালা সুর্যালোক পায়না সেসব দুর্বল ও রোগাক্রান্ত শাখা প্রশাখা নিয়মিত ছাটাইকরে দিতে হবে। অক্টোবর মাসে ফল আহরণের পর ছাঁটাই করার উপযুক্ত সময়। ছাঁটাই করার পর কর্তিত স্থানে বর্দো পেস্টের প্রলেপ দিতে হবে যাতে ছত্রাক আক্রমণ করতে না পারে।

ফল সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা

ফল পূর্ণতা প্রাপ্তির সাথে সাথে ফলের গাঢ় সবুজ বর্ণ হালকা সবুজ বা ফ্যাকাশে সবুজ হতে থাকে। সেপ্টেম্বর- অক্টোবর মাসে ফল পরিপক্ক হলে গাছ হতে সংগ্রহ করা হয়। পরিপক্ক ফল হাত অথবা জালিযুক্ত বাঁশের কোটার সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়। ফল সংগ্রহের পর আঘাতপ্রাপ্ত ও নষ্ট হওয়া ফলগুলো আলাদা করতে হবে। ভাল মানের ফলগুলো প্রয়োজনে গ্রেডিং করে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে ঠাণ্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

দারুচিনির জাত

বারি দারুচিনি-১

জাতের বৈশিষ্ট্য: আকর্ষণীয় বাদামী রঙের সুগন্ধযুক্ত, মিষ্টি ও মধ্যম ঝাঁঝযুক্ত জাত। এর বাকলে রয়েছে চিনামালডিহাইড, চিনামিক এ্যাসিটেট, চিনামাইল এ্যালকোহল ও আরো উদ্বায়ী তৈল যা এর সুগন্ধ, মিষ্টতা ও ঝাঁঝের জন্য দায়ী। দারুচিনি জীবাণুনাশক, রক্ত জমাট বাধা প্রতিরোধী, এটি ব্যথানাশক, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ কমায়। দারুচিনি মসলা হিসাবে, ঔষধশিল্পে, বেভারেজে, পারফিউমে, কসমেটিক্স ও সাবান প্রস্তুতিতে বহুল ব্যবহৃত হয়। গাছের বৃদ্ধির হার ও ফলন ভাল (৭১৪ গ্রাম/গাছ, ৩৮৫কেজি/হে.) ও রোগ বালাই এর আক্রমন সহনশীল।

বারি দারুচিনি-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

আবহাওয়া ও মাটি: সাধারণত উষ্ণ ও অবউষ্ণ আবহাওয়া দারুচিনি চাষের জন্য উপযোগী। সুনিষ্কাশিত উর্বর বেলে দো-আঁশ মাটিতে ভাল হয়। পাহাড়ের ঢালে ও পাহাড়ের উপরে ভাল বায়ু চলাচল উপযোগী ও পর্যাপ্ত সুর্যালোকে এর উৎপাদন ভাল হয়।

জমি তৈরি: যে জমিতে অন্য ফসল ভাল হয় না সে জমি দারুচিনি চাষের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। বাগান আকারে চাষ করতে হলে নির্বাচিত জমি ভাল করে চাষ ও মই দিয়ে সমতল এবং আগাছামুক্ত করে দিতে হবে। পাহাড়ী এলাকা, বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়ে গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে জমিতে চাষ না দিয়ে শুধু পারিষ্কার করে নিলেই চলবে।

রোপণ পদ্ধতি ও সময়: সমতল ভূমিতে দারুচিনি চারা সাধারনত বর্গাকার বা ষড়ভূজী প্রণালীতে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু উঁচু নিচু পাহাড়ে কন্টুর রোপণ প্রণালী অনুসরণ করতে হবে। মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়।

মাদা তৈরিঃ চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে উভয় দিকে ১.০ মিটার দুরত্বে সারিতে ৬০ সে.মি. দুরে দুরে ৩০×৩০×৩০ সেন্টিমিটার মাপের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ৫-১০ কেজি কম্পোস্ট বা পচা গোবর, ১-২ কেজি ছাই, ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে গর্তের উপরের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যাঃ এক বছর বয়সী সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত দারুচিনি চারা/কলম রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে। গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা/কলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগিয়ে তারপর চারদিকে মাটি দিয়ে চারার গোড়ায় মাটি সামান্য চেপে দিতে হবে। রোপণের পরপর খুঁটি দিয়ে চারা/কলমটি খুটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমতো পানি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছের সার প্রয়োগঃ গাছের বৃদ্ধির সাথে সারের পরিমাণ বাড়বে। প্রতিটি গাছের জন্য ৪/৫কেজি কম্পোস্ট বা পচা গোবর, ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১০০ গ্রাম এমওপি ও ১০০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। সবটুকু সার তিন ভাগ করে বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য ও ভাদ্র-আশ্বিন ও মাঘ-ফাগুন মাসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সার দেওয়ার পর প্রয়োজনে পানি দিতে হবে।

আগাছা দমনও সেচঃ গাছের গোড়া নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। পাহাড়ের ঢালে, বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়ে লাগানো গাছের গোড়ায় আগাছা কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে। চারা রোপণের প্রথমদিকে প্রয়োজনমতো সেচ দেয়া দরকার। গাছ বড় হযে গেলে আর সেচের তেমন প্রয়োজন পড়ে না।

ডাল ছাঁটাইকরণঃ চারা অবস্থায় গাছকে সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করে রাখতে হবে। ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে গাছের মরা, রোগাক্রান্ত ও পোকামাকড় আক্রান্ত ডালপালা কেটে পরিষ্কার করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলনঃ দারুচিনি গাছ ২ ইঞ্চি (৫ সে.মি.) পরিমাণ মোটা (ব্যাস) বা দুই বছর বয়স হলে তা গোড়া থেকে ৬ ইঞ্চি বা ১৫ সে.মি উপরে কেটে বাঁকানো ছুড়ি দিয়ে ছাল আলাদা করে নিয়ে হালকা রৌদ্রে বা ওভেনে ৫০°সে. তাপে ভালভাবে শুকিয়ে সংগ্রহ করতে হয়। দারুচিনির প্রথম আবস্থায় প্রতিবার কর্তনে হেক্টরপ্রতি ১৫০ কেজি থেকে ২০০ কেজি এবং পরবর্তীতে ৩০০-৩৫০ কেজি পর্যন্ত দারুচিনি ছাল (Quill) পাওয়া যেতে পারে।

তেজপাতার জাত

বারি তেজপাতা-১

"বারি তেজপাতা-১" সারাবছর বাংলাদেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী। চারা লাগানোর ১৬-১৮ মাসের মধ্যে তেজপাতা সংগ্রহ করা যায়। এ জাতের তেজপাতার গাছের ০.৫ ঘনমিটারে গড়ে ১৫৮১.২৫-১৭০৬.০০ টি এবং এক মিটার লম্বা ডালে ৯৭.০০-১০১.৮০ টি পাতা পাওয়া যায়। একটি পাতায় গড় দৈর্ঘ্য ১৪.৮০-১৫.০৫ সে.মি. ও প্রস্থ ৩.৮৩-৩.৯৩ সেমি। পাতার পুরুত্ব গড়ে ০.৫৯-০.৬৯ মি.মি.। পাতার বোটার দৈর্ঘ্য গড়ে ১.০৫-১.৪৭ সে.মি.। পাতায় শুষ্ক পদার্থের পরমাণ গড়ে ৫৯.২৮-৬২.০% হয়। জাতটিতে লিফস্পট/পাতা পোড়া রোগ অন্যান্য স্থানীয় জাতের তুলনায় অনেক কম হয়। জাতটির ৭-৮ বছর বয়সের একটি গাছ হতে বছরে গড়ে ৩০.০০-৩৪.২৩ কেজি কাঁচা পাতা উৎপাদন হয়।

বারি তেজপাতা-১ এর গাছ

বারি তেজপাতা-১ এর রোগমুক্ত শাখা

বারি তেজপাতা-১ এর রাগমুক্ত উপশাখা

বারি তেজপাতা-১ এর পাতা

বারি তেজপাতা-১ এর সতেজ পাতা

উৎপাদন প্রযুক্তি

জয়বায়ু ও মাটি: উষ্ম ও আর্দ্র জলবায়ু তেজপাতা চাষের জন্য সর্বোত্তম। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৮০০-৩০০০ মি.মি. ও গড় তাপমাত্রা ২৮-৩৫°C হলে পাতার ফলন ও

গুণগতমান উভয়ই ভাল হয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হলে রোগের আক্রমণ ও ডাল (মাইট দ্বারা আক্রান্ত) রোগের প্রকোপ কম হয়। তবে তেজপাতার পরিবেশ উপযোগিতা ব্যাপক বিধায় আদ্র ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সফলভাবে এর চাষ করা সম্ভব। উঁচু সুনিষ্কাশিত বেলে দোআঁশ অথবা দোআঁশ বা এঁটেল দোআঁশ মাটি তেজপাতা চষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। তবে বাংলাদেশের সর্বত্রই সব ধরনের মাটিতেই বারি তেজপাতা-১ চাষ করা যায়।

বংশ বিস্তার: দুভাবে বংশ **বিস্তার** করা যায়। বীজ থেকে এবং কলম থেকে চারা তৈরি করে। কলমের চারা উত্তম কারণ এতে বংশগত গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে।

বীজ হতে বারি তেজপাতা-১ এর চারা উৎপাদন

বীজ হতে চারা উৎপাদন: তেজপাতা বীজ থেকে চারা তৈরি করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। বীজের ডরমেনসি খুবই কম হওয়ায় বীজ সংগ্রহের ১-২ দিনের মধ্যে বীজ চারা তৈরি করার জন্য ব্যবহার করতে হবে। বীজ পেকে যখন কালো বর্ণ ধারণ করবে, তখন বুঝতে হবে বীজ সংগ্রহের সঠিক সময়। এই সময়ে বীজ সংগ্রহ করে পূর্বের প্রস্তুতকৃত মাটি ভর্তি প্রতিটি পলি ব্যাগে ২-৩ বীজ দিতে হবে। বীজ বপনের পর পলিব্যাগে সেভিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে। এতে করে পিঁপাড়া বীজের ক্ষতি করতে পারবেনা। উপযুক্ত পরিবেশে বীজ থেকে চারা হতে ১২-১৪ দিন সময় লাগে। এর পর হতে নিময়তিভাবে ঝর্ণা দ্বারা পানি দিতে হবে, যা মাটিতে সমসময় আদ্রতা বজায় থাকে।

জোড় কলমের মাধ্যমে তেজপাতার চারা উৎপাদন

কলমের মাধ্যমে চারা তৈরি করণ: সাধারণত পার্শ্বিয় জোড় কলম (Side grafting) ব্যবহার করে চারা তৈরি করা হয়। সাধারণত কাবাব চিনির চারাকে রুটষ্টক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পালিব্যাগে/মাটির ছোট টবে কাবাব চিনির চারা তৈরি করে নেয়া হয়। চারা ১.৫-২.০০ ফুট উঁচু হবে তখন কলমের জন্য উপযুক্ত হয়। মধ্য চৈত্র-বৈশাখ হতে জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত (এপ্রিল-মে) কলম করার

উপযুক্ত সময়। নির্বাচিত তেজপাতার শাখাকে (পেনসিলের মতো মোটা) সায়ন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এরপর কমলম করা হয়।

জমি তৈরি ও চারা রোপণঃ বাগান আকারে গাছ লাগাতে হলে গভীরভাবে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করা উচিত। এতে দীর্ঘজীবি আগাছা দমন হবে। বাড়ির আশে পাশে পুকুর পাড়ে কিংবা রাস্তার ধারে গাছ লাগালে চাষ না দিয়ে সরাসরি গর্ত করে তেজপাতার চারা লাগানো যায়। চারা লাগানোর জন্য ৪-৬ মিটার দূরত্বে ০.৮০ × .৮০×০.৮০ মিটার আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে প্রতি গর্তে ২৫ কেজি পচা গোবর ১৫০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম এমওপি ও ৫০ গ্রাম জিপসাম সার প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে রাখতে হবে। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। চারা রোপণের পূর্বে গর্তের মাটি কোদাল দিয়ে উলট-পালট করে নিতে হবে। রোপণের পর চারাটিকে একটি শক্তখুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে এবং গোড়ায় পানি দিতে হবে।

সার প্রয়োগঃ গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও অধিক ফলনশীলতার জন্য গাছে নিয়মিত সার প্রয়োগ অপরিহার্য। সারের মাত্রা নির্ভর করে গাছের বয়স ও মাটির উর্বরতার উপর। বিভিন্ন বয়সের গাছে সারের মাত্রা।

গাছের বয়স	গাছে প্রতি সারের পরিমাণ				
	গোবর	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম
১-২ বছর	১২	২৫০	২০০	২০০	৫০
৩-৪ বছর	১৭	৪০০	৩৫০	৩৫০	৮০
৫-৬ বছর	২২	৬৫০	৬০০	৬০০	১২০
৭-৮ বছর	২৭	৮৫০	৭৫০	৭৫০	১৬০
৯ বা তদুর্দ্ধ	৩২	১০৫০	৯৫০	৯৫০	২০০

এছাড়া অঞ্চলভিত্তিক যেসব সারের অধিক ঘাটতি রয়েছে সেসব সারও প্রয়োগ করতে হবে। উল্লিখিত সার সমান দুই কিস্তিতে পাতা সংগ্রহের পর পর প্রয়োগ করতে হবে। সার মাটির সাথে ভালভাবে মিশাতে হবে এবং প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে।

পানি সেচ ও পরিচর্যাঃ শুষ্ক মৌসুমে বিশেষত চারা গাছে এবং বয়স্ক গাছে পাতার বাড়ন্ত অবস্থায় সেচ দিলে ফলন ও পাতার গুণগতমান বৃদ্ধি পায়। মাটির আর্দ্রতার উপর ভিত্তি করে খরিফ-১ এ ২-৩ টি এবং রবি মৌসুমে ৪-৫ টি সেচ দিতে হয়। চাষ দিয়ে বা কোঁদাল দিয়ে কুপিয়ে তেজপাতার বাগানের আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

পাতা সংগ্রহঃ সাধারণত বছরে ২ (দুই) বার পাতা সংগ্রহ করা হয়। গাছ হতে তেজপাতা সংগ্রহের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গাছের ছোট ছোট ডাল না ভেঙ্গে যায় । আবহাওয়া অনুকূল ও পরিমিত পরিচর্যা করলে ৭-৮ বছরের একটি গাছ হতে বছরে প্রায় ৩০.০০- ৩৪.২৩ কেজি উৎপাদত হবে ।

পানের জাত

বারি পান-৩

জাতটি ২০১৭-১৮ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অবমুক্ত হয় যা "বারি পান-৩" নামে পরিচিত। পাতাগুলি গাঢ় সবুজ বর্ণের, বড় ও বোটা লম্বা । বারি পান-৩ বাংলাদেশের সর্বত্র সারা বছর চাষ উপযোগী । পান বরজের পরিচর্যা সময়মতো ও সঠিকভাবে গ্রহণ করা গেলে লতা লাগানোর ৬-৮ মাসের মধ্যে পান সংগ্রহ করা যায় । এ জাতের লতা প্রতি মাসে গড়ে ৩১.০০- ৩৩.৬৩ সেমি করে বৃদ্ধি পায় । এক মিটার দৈর্ঘ্যের লতায় গড়ে ১৯.২৭-২২.২৫ টি পান পাওয়া যায় । একটি পাতার আয়তন ১৯৯.৫৫-২১৪.৮৫ বর্গ সেমি ও একক পাতার ওজন ৫.৭১- ৬.১৩ গ্রাম।

বারি পান-৩ এর বরজ

বারি পান-৩ এর পাতা

বারি পান-৩ এর বিড়া

পাতার পুরুত্ব গড়ে ০.৭৫- ০.৯০ মিমি ও পাতার বোটার দৈর্ঘ্য গড়ে ৮.৯০- ৯.৩৪ সেমি হয়। জাতটিতে রোগ ও পোকার আক্রমণ অন্যান্য জাতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম হয় । জাতটি হতে বছরে প্রতি হেক্টরে ৩৭.৫০-৪০.৯১ লাখ পান উৎপাদিত হয় বা বছরে হেক্টর প্রতি ২০.০০-২২.৪৩ টন ।

উৎপাদন প্রযুক্তি

আবহাওয়া, জলবায়ু ও মাটিঃ ছায়াযুক্ত, গ্রীষ্মমন্ডলীয় বন্য পরিবেশে পান ভাল জন্মে। আমাদের দেশে খরিফ মৌসুমে পান উৎপাদনের অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করায় উৎপাদনের পরিমাণ রবি মৌসুমের তুলনায় দ্বিগুন হয়। পান চাষের জন্য বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ২২৫০-৪৭৫০ মি.মি. আপেক্ষিক আদ্রতা ৪০-৮০% এবং তাপমাত্রা ১৫-৪০ ডিগ্রি সে.। তবে ১৫-২৫ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় পান ভাল হয়। বরজ এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেখানে গাছের জন্য প্রয়োজনীয় আলো বাতাস চলাচল করতে পারে। নিষ্কাশনযুক্ত, উর্বর বেলে বা বেলে দোআঁশ বা এঁটেল মাটি পানচাষের জন্য বেশি উপযোগী । মাটির পিএইচ ৫.৬ থেকে ৮.২ হলে পান চাষের জন্য ভাল হয় ।

জমি নির্বাচনঃ জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ এবং সুনিষ্কাশিত দোআঁশ, কর্দম দোআঁশ এবং পলি দোআঁশ মাটি পান চাষের জন্য উপযোগী । মাটির পিএইচ ৫.৬ থেকে ৮.২ হলে পান চাষের জন্য ভাল হয় ।

জমি তৈরি ও মাটি শোধনঃ ৩-৪ টি চাষ দিয়ে মাটি তৈরি করা উচিত। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ১ মাস ধরে স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ঢেকে রেখে মাটি শোধন করতে হবে । তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য মাঝে মধ্যে বিকালের দিকে চাদর সরিয়ে অল্প পানি ছিটিয়ে দিয়ে আবার পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ৬০ মিলি ফরমালিনে ১০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে প্রতি বর্গমিটার জমিতে প্রয়োগ করে পলিথিন দিয়ে ৪-৫ দিন ঢেকে রাখতে হবে। মাটি শোধনের ২০-২৫ দিন পর লতা রোপণ করতে হবে ।

লতা নির্বাচন ও শোধনঃ পানের লতা বা কাচিং লাগানোর জন্য সতেজ ও রোগমুক্ত বরজ হতে লতা বা কাটিং সংগ্রহ করতে হবে। গাছের উপরের এক মিটারের মধ্যে থেকেই কাটিং সংগ্রহ করা উচিৎ। লতা মাটিতে লাগানোর আগে প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম প্রোভ্যাক্স-২০০ বা অটোস্টিন/ব্যাভিস্টিন ও এডমায়ার ১ মিলি মিশিয়ে এর জলীয় দ্রবণে ১২-১৫ মিনিট চুবিয়ে শোধন করে নিতে হবে। এর পর লতা ছায়াতে রেখে শুকিয়ে নিতে হবে। লতা সংগ্রহের ৫-৬ দিন পূর্বে গাছের ডগার দিকে ২-৩ সেমি ভেঙ্গে দিলে ভাল হয়। রোপণ দূরত্ব অনুযায়ী হেক্টরে ৭০ থেকে ৮০ হাজার কাটিং প্রয়োজন হয় ।

রোপণ পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপনা

- পান বরজে সেচ ও নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে ।
- চারা গাছের জন্য পর্যাপ্ত ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে ও লতা আকড়ে ধরার জন্য অবলম্বনের ব্যবস্থা করতে হবে ।

কাটিং বা চারা প্রস্তুতকরণ

- ২ বছর বয়সের পুরাতন, সুস্থ, সবল ও নিরোগ লতা নির্বাচন করতে হবে । লতা থেকে কাটিং সংগ্রহ করে ৮-১০ সেমি গভীর উর্বর মাটিতে বর্ষাকালে ৫০-৬০ সেমি এবং শরৎকালে ৪০-৫০ সেমি দূরে দূরে লাগাতে হবে ।
- পান গাছের কাণ্ডকে ছোট ছোট টুকরায় কেটে চারা তৈরি করতে হবে । প্রতিটি কাটিং লম্বায় ৩০-৪০ সেমি হতে হবে ও ৩-৫টি গিঁট (পর্ব) এবং ৩-৪ টি পাতা থাকলে ভাল হয় ।
- পানের লতার উপরের, মাঝের বা গোড়ার যে কোন অংশ কাটিং হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তবে গোড়ার অংশের তুলনায় উপরের ও মাঝের অংশ হতে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে শিকড় ও কুশি গজাতে পারে ।
- বীজ লতা হতে সংগ্রহ করে প্রায় ৮০ টির মতো কাটিং একত্রে বেধে একটা বান্ডিল তৈরি করা হয়। এ বান্ডিলে কাদা মেখে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে । ২-৩ দিনের মধ্যে পর্বসন্ধি হতে নতুন শিকড় বের হলে কাটিং লাগানো যায় ।

লতা রোপণের সময়: বছরের যে কোন সময় লতা লাগানো যায়। তবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, আশ্বিন-কার্তিক ও ফাল্গুন মাসে লতা লাগানো হলে ভাল ফল পাওয়া যায়। খরিফ মৌসুমে মধ্য ফাল্গুন হতে মধ্য চৈত্র মাসে পানের চারা রোপণ করা হয়। আবহাওয়ার তারতম্য ও অঞ্চল ভেদে চারা রোপণের উপযুক্ত সময়ের তারতম্য হয়। কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও নড়াইলে মধ্য ফাল্গুন হতে মধ্য চৈত্র মাসে, যশোরে মধ্য জৈষ্ঠ হতে মধ্য শ্রাবণ মাসে, বরিশালে ও বাগেরহাটে মধ্য জ্যৈষ্ঠ হতে মধ্য আষাঢ় মাসে, পটুয়াখালী আষাঢ় হতে শ্রাবণ মাসে, রাজশাহীতে মধ্য মাঘ হতে মধ্য চৈত্র মাসে, চট্টগ্রামে মধ্য জৈষ্ঠ হতে মধ্য ভাদ্র মাসে, কক্সবাজারে মধ্য শ্রাবণ হতে মধ্য ভাদ্র মাসে পানের কাটিং রোপণ করা হয়।

সার ব্যবস্থাপনা: জমি তৈরির সময় সার প্রয়োগ চারা লাগানোর পূর্বে হেক্টর প্রতি ৮-১০ টন পচা গোবর সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

পান বরজে সার প্রয়োগ: পান অধিক মাত্রায় পুষ্টি গ্রহণ করে। সাধারণত খৈল, কোন কোন এলাকায় ইউরিয়া সার দেয়া হয়। কাঠা প্রতি জায়গায় বছরে টিএসপি ৩

কেজি, এমওপি ৩ কেজি, সরিষা বা নিম খৈল ২০ কেজি প্রয়োগ করা যেতে পারে। সার ও খৈল বছরে ৫-৬ টি ভাগে প্রয়োগ করা যেতে পারে। পান গাছের খাবার লতার গোড়ায় দেওয়া যাবে না। ২ সারির মাঝখানে ২ ইঞ্চি খুড়ে খৈল বা রাসায়নিক সার দিতে হবে। খৈল পচিয়ে তারপরে বরজে দিলে গাছ ভাল ভাবে গ্রহণ করতে পারে ও রোগবালাই কম হবে।

সারের মাত্রা

নতুন বরজে সার প্রয়োগের পরিমাণ ও সময়কাল

সারের নাম	পরিমাণ /হেক্টর	সার প্রয়োগ পদ্ধতি
গোবর	১০-১৫ টন	সবটুকু জমি তৈরির সময়
খৈল	৬ টন	১২ কিস্তি (চারা লাগানোর ২ মাস পর হতে ৩০ দিন পর পর) সার প্রয়োগ করতে হবে।
ইউরিয়া	২১৭ কেজি	১২ কিস্তি (চারা লাগানোর ২ মাস পর হতে ৩০ দিন পর পর) সার প্রয়োগ করতে হবে।
টিএসপি	১১০ কেজি	সবটুকু সবটুকু জমি তৈরির সময়
এমপি	৮৪ কেজি	সবটুকু সবটুকু জমি তৈরির সময়
জিপসাম	৫০ কেজি	সবটুকু সবটুকু জমি তৈরির সময়
জিংসালফেট	১৫ কেজি	সবটুকু সবটুকু জমি তৈরির সময়

*(**Source :** Effect of N, P and K on the yield and quality of betel leaf, Anual Research Report 2014-15, Spices Research Centre, Shibganj, Bogura)*

পুরাতন বরজে সার প্রয়োগের পরিমাণ ও সময়কাল

সারের নাম	পরিমাণ /হেক্টর	সার প্রয়োগ পদ্ধতি
খৈল	৪ টন	জুন-নভেম্বর, ১৫ দিন পর পর ১২ কিস্তিতে।
ইউরিয়া	১৮০ কেজি	জুন-নভেম্বর, ১৫ দিন পর পর ১২ কিস্তিতে।
টিএসপি	১৫০ কেজি	মে মাসে ১ কিস্তিতে
এমপি	৭৫ কেজি	মে মাসে ১ কিস্তিতে
জিপসাম	৫০ কেজি	মে মাসে ১ কিস্তিতে
জিংক সালফেট	১৫ কেজি	মে মাসে ১ কিস্তিতে

সেচ প্রদান: সফলভাবে পান চাষের জন্য সঠিক মাত্রায় সেচ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। পান বরজের মাটিতে সবসময় আদ্রতা বজায় রাখতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে ৬-৭ দিন পর পর সেচ দিতে হবে। কিন্তু বর্ষাকালে পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা

- পানের লতা লাগানোর ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে সতেজ হয়ে উঠে এবং ১ মাসের মধ্যে প্রথম পাতা গজায়।
- চারা একটু বড় হলেই এর খাড়া ভাবে বর্ধিত হওয়ার জন্য পাটকাটি বা বাশের কঞ্চি পুতে এর সাথে পান গাছ বেধে দিতে হবে।
- রোপণ পরবর্তী যত্নের উপর পানের উৎপাদন ও ফলন নির্ভর করে। রোপণ পরবর্তী যত্নের মধ্যে শূন্যস্থান পূরণ, সার প্রয়োগ, গোড়াই মাটি তুলে দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার, সেচ ও নিষ্কাশান, লতা নামানো ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

লতা নামানো ও বরজে মাটি তুলে দেওয়া

- সাধারণত পান গাছকে ১-১.৫ মিটারের বেশি লম্বা হতে দেওয়া উচিত নায়। পানের লতা যখন বরজের ছাউনি পর্যন্ত (২-২.৫ মিটার) পৌঁছায় তখন তা নিচে নামিয়ে পাতা বিহিন অংশকে পেচিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।
- আমাদের দেশে বছরে সাধারণত ২বার (মাঘ-বৈশাখ ও আষাঢ়-আশ্বিন) পানের লতা নামানো হয়। কোন কোন স্থানে ৩-৪ বার লতা নামানো হয়।
- আন্তঃপরিচর্যা করার ফলে পান লতার গোড়ার মাটি সরে যায়। এর ফলে শিকড় মাটি থেকে বের হয়ে আসে এবং মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয়। এর ফলে লতা ধিরে ধিরে দুর্বল হয় ও রোগবালাই বৃদ্ধি পায়। এ জন্য বছরে ১-২ বার বাহির হতে ঝুরঝুরে মাটি এনে গাছের গোড়ায় দিতে হবে।

পান সংগ্রহ

সময়মত যত্ন ও পরিচর্যা করলে চারা লাগানোর ৬ মাস পর হতে পান তোলা যেতে পারে। প্রতিটি গাছ হতে মাসে ৩-৪ বার পান তোলা যায়। পানের লতা লাগানোর ৬-৮ মাসের মধ্যে পাতা সংগ্রহ করার উপযুক্ত হয়।

পাতার ফলন

আমাদের দেশের পানের গড় ফলন প্রতিবেশি দেশ ভারতের তুলনায় অনেক কম। এর অন্যতম কারণ যত্ন ও পরিচর্যার অভাব, সুষম সার প্রয়োগ না করা, আবহাওয়া,

মাটি, জাত, চাষাবাদ পদ্ধতি, রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ ইত্যাদি। আমাদের দেশে গড়ে বছরে হেক্টরপ্রতি ১৬-২০ লক্ষ পান উৎপন্ন হয়। সেখানে ভারতে ৫০-৭০ লক্ষ পান উৎপন্ন হয়। বরজ তৈরির প্রথম বছরে পানের ফলন কম হয়। এবং দ্বিতীয় বছরে ফলন বৃদ্ধি পায়। একই জমিতে ১০-১২ বছরের বেশি সময় পর্যন্ত পান চাষ করা ঠিক হবে না।

উৎপাদন বাড়ানো খরচ কমানো

পান চাষে কম খরচের মাধ্যমে অধিক পরিমাণ লাভ করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে

- উচ্চ ফলনশিল পানের জাত চাষ করা।
- সুষমমাত্রায় সার প্রয়োগ করা ।
- শুষ্ক মৌসুমে সেচের ব্যবস্থা করা
- সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতিতে সঠিক মাত্রায় সঠিক বালাইনাশক ব্যবহার করা।
- সর্বোপরি নিবিড় যত্ন ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করা।

সংগ্রহ এবং সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থা

গাছ লাগানোর ৬-৮ মাস পর পান পাতা সংগ্রহ করা যায় এবং তার পর প্রতি ১৫-২৫ দিন অন্তর অন্তর পাতা সংগ্রহ করা যায়। পান গাছ লম্বায় ১.২ থেকে ১.৮ মিটার হলে পাকা সংগ্রহ করা যায়। কাণ্ডের নিচের অংশ থেকে পাতা সংগ্রহ হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে পরিনত পাতা প্রধান কাণ্ডের নিচের অংশ থেকে ২-৩ বার সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে পান পাতা প্রধান কাণ্ডে ও পার্শ্বীয় কাণ্ড হতে সংগ্রহ করা হয়। দূরর্বতী বাজারের জন্য পান পাতা তিন সপ্তাহ ও স্থানীয় বাজারের জন্য দুই সপ্তাহ পর পর সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহকৃত পাতা পরিষ্কার করে পাতার আকৃতি ও গুণগত মান অনুযায়ী বাছাই করা হয়। তারপর সেগুলো বোটার অংশ বিশেষ কেটে এবং নস্ট পাতা অপসারণ করে প্যাকেট করা হয়। পরিষ্কার করার জন্য পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত পানি ব্যবহার করা হয়। কর্মীদেরকে নিজেদের হাত জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় মানসম্মত উপায় অবলম্বন করতে হবে। স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অবলম্বন করে সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে গুণগত মান বজায় থাকে এবং সংগনিরোদ (quarantine) নিশ্চিত করা যায়।

একাঙ্গীর জাত

বারি একাঙ্গী-১

একাঙ্গী একটি বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। গাছের উচ্চতা ১০-১৫ সেন্টিমিটার। পাতার দৈর্ঘ্য ১২-১৫ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ১০-১২ সেন্টিমিটার। রাইজমের দৈর্ঘ্য ৫.৫-৬.৫ সেন্টিমিটার। প্রতিটি রাইজমে ফিঙ্গারের সংখ্যা ৬-৮টি। একাঙ্গী রোগ ও পোকা সহনশীল। ফলন ১২- ১৫ টন/হেক্টর।

রাইজম

বারি একাঙ্গী-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও জলবায়ু: প্রায় সব ধরনের মাটিতেই একাঙ্গীর চাষ করা সম্ভব। তবে পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোআঁশ থেকে বেলে দোআঁশ মাটি একাঙ্গী চাষের জন্য উত্তম। একাঙ্গী চাষের জন্য উপযোগী পিএইচ হলো ৬-৬.৫। বার্ষিক ২৫০০-৩০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত একাঙ্গী চাষের জন্য উত্তম। ৩০-৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় একাঙ্গীর দৈহিক বৃদ্ধি ও ফলন ভাল হয়। একাঙ্গী হালকা ছায়াযুক্ত স্থানে চাষ করা যায়।

বীজ শোধন: ১০০ লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ অথবা অটোস্টিন মিশিয়ে বীজকে ৩০-৪৫ মিনিট ভিজিয়ে রেখে শোধন করতে হবে। ভিজানো বীজকে ছায়াযুক্ত জায়গায় শুকিয়ে তারপর জমিতে রোপণ করতে হবে।

মাটি শোধন: গভীরভাবে চাষ দিয়ে মাটি উল্টিয়ে রেখে দিলে রোগ জীবাণু ও পোকামাকড় সূর্যের তাপে নষ্ট হয়ে যায়। মাটির উপর খড়কুটা দিয়ে পুরু স্তর তৈরি করে পুড়িয়ে অথবা জমিতে বিঘাপ্রতি ১.৫-২.০ কেজি ফুরাডান বা নিম কেক (২ কেজি/শতকে) প্রয়োগের মাধ্যমেও মাটি শোধন করা যায়।

রোপণ সময়: এপ্রিলের ১ম সপ্তাহ থেকে মে মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত একাঙ্গী লাগানোর উপযুক্ত সময়। বিলম্বে রোপণ করলে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন কম হয়।

বীজের আকার ও হার: ২০-২৫ গ্রাম ওজনের রাইজোম/রোপণের জন্য উত্তম। বীজের হার নির্ভর করে রাইজোমের আকার আকৃতির উপর। বীজ হিসেবে মোথা উত্তম ও ফলন বেশি দেয়। তবে ছড়া (Finger) ব্যবহার করলে কম পরিমাণে বীজের দরকার হয়। সাধারনত প্রতি হেক্টরে ১২০০-১৪০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

জমি তৈরি ও রোপণ দূরত্ব: জমি তৈরি করতে ৩-৪টি চাষও মই দিতে হবে। সাধারনত একাঙ্গীর জমিতে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০-৫০ সে. মি. এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২০-২৫ সেন্টিমিটার রাখা হয়। পানি সেচ ও নিষ্কাশনের জন্য দুই বেডের মাঝে ৫০-৬০ সেন্টিমিটার প্রশস্থ নালা রাখাতে হবে যাতে করে প্রয়োজনীয় সেচ প্রদান ও অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা যায়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: ভাল ফলন পাওয়ার জন্য জমিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জৈব রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। একাঙ্গী চাষের জন্য হেক্টরপ্রতি নিম্নে উল্লেখিত পরিমাণে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	পরবর্তী পরিচর্যা হিসাবে প্রয়োগ		
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি	৩য় কিস্তি
পচা গোবর	৫ টন	সব	-	-	-
ইউরিয়া	২৬০ কেজি	-	১৩০	৬৫	৬৫
টিএসপি	২৩০ কেজি	সব			
এমওপি	১৯০ কেজি	৯৫	-	৫০	৪৫
জিমসাম	১১০ কেজি	সব	-	-	-
জিংক	৩ কেজি	সব	-	-	-

শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক এবং অর্ধেক এমওপি সার জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সারের অর্ধেক বীজ রোপণের ৬০ দিন পর পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমওপি সার দুই কিস্তিতে বীজ রোপণের ৯০ ও ১২০ দিন পর পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে। এ সময় দুই দিক থেকে মাটি উঠিয়ে দিতে হবে। প্রতিবার সার প্রয়োগের পূর্বে জমি আগাছা মুক্ত করতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা: মাটিতে আর্দ্রতা কম থাকলে বীজ রোপণের পরপরই সেচ দিতে হবে। একাঙ্গীর সঠিক বৃদ্ধি ও পানি নিষ্কাশনের জন্য দুই সারির মাঝের মাটি গাছের গোড়ায় তুলে দিতে হবে। একাঙ্গীর গজানোর পর ফসলের সাথে আগাছার প্রতিযোগিতা রোধ করার জন্য জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। এইভাবে যতবার সম্ভব প্রয়োজন অনুসারে ফসলকে আগাছা মুক্ত করতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ

বৃষ্টি না হলে একাঙ্গীর জমিতে সেচ দিতে হবে । জমিতে এমনভাবে সেব দিতে হবে যাতে জমিতে পরিমিত রস থাকে কিন্তু জমি অতিরিক্ত ভেজা / দাড়ানো পানি না থাকে।

আন্তঃফসল চাষঃ একাঙ্গী হালকা ছায়া পছন্দ করে কাজেই একাঙ্গীর সংগে আন্তঃফসল হিসাবে মরিচ, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ, লালশাক, শিম, লাউ ইত্যাদি ফসল চাষ করা যায়। এছাড়া নতুন ফলের বাগানে সারি ফল গাছের মাঝে আন্তঃফসল / মিশ্র ফসল হিসাবে একাঙ্গীর চাষ করা যায়।

ফসল সংগ্রহঃ সাধারনত জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি মাসে একাঙ্গীর উঠানো হয়। একাঙ্গী রোপণের ৯-১০ মাস পর গাছের পাতা যখন হলুদ রং ধারণ করে শুকিয়ে যায় তখনই একাঙ্গী সংগ্রহের উপযুর্ক্ত সময় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সংগ্রহের পরে একাঙ্গীতে লেগে থাকা মাটি, শিকড় , গাছের কাণ্ড ও পাতা পরিষ্কার করতে হবে।

সংরক্ষণঃ সাধারণত একাঙ্গীর ক্ষেত্রে ছড়া (Finger) ও মোথাকে বীজ হিসাবে রাখা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে মোথা হতে উৎপন্ন গাছ অপেক্ষাকৃত সবল হয়। ছড়াও বীজ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তবে এক্ষেত্রে ফলন কম হয়। একাঙ্গীর রাইজোমকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্পের জন্য ব্যবহার উপযোগী করা হয়। বাছাইকৃত রাইজোম বা ছড়া মাটির গর্তে রাখলে বেশী দিন পর্যন্ত ভাল রাখা যায়। ১x১x১ ঘনমিটার গর্ত করে তা বেশ কয়েক দিন খোলা রেখে শুকিয়ে নিতে হবে। গর্তের গভীরতা বেশ হলে অধিক আর্দ্রতার কারণে একাঙ্গীর শিকড় ও গজানোর পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় । গর্ত একাঙ্গী দিয়ে ভর্তি করার পর উপরে খড় বিছিয়ে মাটি চাপা দিয়ে গর্ত বন্ধ করে দিতে হবে। বীজ একাঙ্গী মাটির গর্তে রাখার উদ্দেশ্যই হচ্ছে একাঙ্গীর আর্দ্রতা ধরে রাখা। কারণ খোলা বাতাসে থাকলে একাঙ্গীর সতেজতা এবং ওজন কমে যায়।

ফলনঃ সাধারণত প্রতি হেক্টর ১২-১৫ টন একাঙ্গীর ফলন পাওয়া যায়।

চিভ এর জাত

বারি চিভ-১

এ জাতের গাছের উচ্চতা ৩০-৪০ সেন্টিমিটার। পাতার দৈর্ঘ্য ২৩-৩০ সেন্টিমিটার। বাল্ব লম্বাকৃতির, বাল্বের দৈর্ঘ্য ১.০-১.৪৫ সেন্টিমিটার । চারা লাগানো থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্ত ৬৫-৭০ দিন সময় লাগে। চিভ পোকামাকড় ও রোগ সহনশীল। ফলন হেক্টরপ্রতি ১০-১২ টন (গাছ ও পাতাসহ)।

বারি চিভ-১

পাতাসহ গাছ

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও জলবায়ুঃ সেচ ও পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত ও জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ বেলে দোআঁশ থেকে দোআঁশ মাটি চিভ চাষের জন্য উপযোগী। মাটির পিএইচ ৬.৩-৬.৮ হলে চিভ এর বৃদ্ধি ভাল হয়। চিভ এর চাষের জন্য বছরে ২৫০০-৩০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। ১৩-২৫° সে. তাপমাত্রা চিভ চাষের জন্য উপযোগী।

জমি তৈরিঃ জমিতে ৬-৭টি গভীরভাবে (১৫-২০ সে.মি.) চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে ও পরে মই দিয়ে সমতল করতে হবে। জমির আগাছা বেছে ফেলতে হবে। মাটির ঢেলা ভেঙ্গে ঝুরঝুরে ও সমান করে জমি তৈরি করতে হবে। চিভ চাষের জন্য ৩.০ মিটার X ১.৫ মিটার আকারের বেড তৈরি করতে হবে এবং বেডের উচ্চতা ১৫-২০ সেন্টিমিটার হতে হবে। পানি সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য দুই বেডের মাঝে ৫০-৬০ সেন্টিমিটার প্রশস্থ নালা থাকতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতিঃ ফলন বেশি পেতে হলে সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করতে হবে। জৈব সার প্রয়োগ মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধি পায় ও ফলন বেশি হয়। মাটিতে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানের উপর সারের মাত্রা নির্ভর করে। চিভ এর জন্য প্রতি হেক্টরে নিম্নোক্ত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	পরবর্তী পরিচর্যা হিসেবে প্রয়োগ	
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি
গোবর/কম্পোষ্ট	৫ টন	সব	-	-
ইউরিয়া	১৪০ কেজি	৭০ কেজি	৩৫ কেজি	৩৫ কেজি
টিএসপি	২০০ কেজি	সব	-	-
এমওপি	৯০ কেজি	৪৫ কেজি	২২.৫ কেজি	২২.৫ কেজি
জিপসাম	৫০ কেজি	সব	-	-

শেষ চাষের সময় সবটুকু গোবর/কম্পোস্ট, টিএসপি, অর্ধেক ইউরিয়া ও এমওপি সার জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া এবং এমওপি সার সমান ভাগে ভাগ করে যথাক্রমে চারা রোপণের ২৫ এবং ৫০ দিন পর দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সার প্রয়োগের পূর্বে জমি আগাছামুক্ত করতে হবে।

রোপণ সময়: বাংলাদেশে সারা বছর চিভ চাষ করা সম্ভব। তবে চিভ লাগানোর উপযোগী সময় এপ্রিল-মে মাস **পর্যন্ত।**

বীজ হার ও রোপণ দূরত্ব: প্রতি হেক্টরে ২০০০০০-৩০০০০০ চারা/ক্লাম্প ডিভিশন (Clump division) লাগে। প্রতিটি চারা ২০-২৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে ১৫-২০ সেন্টিমিটার পরপর লাগাতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা: চিভ এর চারা রোপণের পর একটি প্লাবন সেচ দিতে হবে। চারা রোপণ এবং সেচের পর জমিতে প্রচুর আগাছা জন্মাতে পারে। আগাছা জমির রস ও অন্যান্য খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত করে। এই জন্য ২-৩ বার বা ততোধিক নিড়ানী দিয়ে জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। জমির 'জোঁ' অবস্থা দেখে ২০-২৫ দিন পর পর সেচ দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: চারা লাগানোর ৬৫-৭০ দিন পর থেকে ফসল সংগ্রহ করা যায়। গাছের গোড়া থেকে ২-৩ ইঞ্চি উপরে পাতা কেটে অথবা পুরো গাছ উঠিয়ে ফসল সংগ্রহ করা যায়। ফসল সংগ্রহের পর বাজার জাতকরণের জন্য পাতা/গাছ ভাল ভাবে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হবে এবং গাছের শিকড় কেটে ফেলতে হবে। বছরে ৫-৬ বার ফসল সংগ্রহ করা যায়।

ফলন: পাতা ও গাছসহ প্রতি হেক্টরে ১০-১২ টন ফলন পাওয়া যায়।

জিরার অল্টারনারিয়া ব্লাইট রোগ দমন প্রযুক্তি

বাংলাদেশে জিরার কোন নির্দিষ্ট জাত নেই । জিরা চাষের মূল সমস্যা হলো রোগ। মসলা গবেষণা কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, বগুড়া জিরা সমস্যা যে রোগ তার জীবাণু ও এর সমাধান নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণার ফলে এই প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয় । গোড়া পচা (Root rot) ও অল্টারনারিয়া ব্লাইট (Alternaria blight) জিরার প্রধান রোগ । *অল্টারনারিয়া বার্‌নসি* (*Alternaria burnsii*) নামক ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগ হয় । এই রোগের কারণে ক্ষতির তীব্রতা এত বেশি যে জিরার ফলন শতভাগ পর্যন্ত নষ্ট গওয়ার সম্ভাবনা থাকে । এই রোগ বীজ বাহিত ও বাতাসের মাধ্যমে এক গাছ হতে অন্য গাছে বিস্তার লাভ করে ।

রোগ আক্রমণের সময়: কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘলা পরিবেশ, উষ্ণ ও আদ্র আবহাওয়া এই রোগের জন্য অনুকূল অবস্থা । জিরার এই রোগ সাধারণত বৃদ্ধির সকল পর্যায়ে হতে পারে। তবে ফুল আসার ঠিক ৬-৮ দিন পূর্বে অর্থাৎ গাছের বয়স যখন ৪০-৪৫ দিন হবে, তখন এই রোগের প্রাদুর্ভাব শুরু হয় যা ফসল সংগ্রহকালীন সময় পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে ।

লক্ষণ

- জিরার ফুল আসার ঠিক পূর্বমুহূর্তে অর্থাৎ ৬-৮ দিন পূর্বে এই রোগের আক্রমণ শুরু হয় ।
- গাছের শাখা-প্রশাখার অগ্রবর্তি অংশে পচন ধরে।
- পরবর্তীতে পচা অংশ ভেজা থাকে ও শুকিয়ে কালো বর্ণ ধারণ করে।
- গাছ শুকিয়ে উপর হতে মরা শুরু করে ও পরবর্তীতে সমস্ত গাছ মারা যায় ।

দমন পদ্ধতি

- পানি নিষ্কাশনযোগ্য উচু জমিতে জিরার চাষ করতে হবে ।
- একই জমিতে বার বার জিরা চাষ না করা ।
- পুষ্ট ও রোগমুক্ত জিরার বীজ ব্যবহার করতে হবে ।
- রোগের লক্ষণ দেখা দিলে বা ফুল আসার পূর্ব হতে প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মিলি এমিষ্টারটপ মিশিয়ে ৬-৭ দিন অন্তর অন্তর ৫-৬ বার বিকালে অথবা কুয়াশাচ্ছন্নমুক্ত আবহাওয়ায় সকালে সমস্ত গাছে স্প্রে করতে হবে ।

এমিস্টার টপ প্রয়োগকৃত জিরা গাছের বিভিন্ন অবস্থা

কন্ট্রোল প্লট

এমিস্টার টপ প্রয়োগকৃত জিরা গাছের পরিপক্ক অবস্থা

মেথীর মূল ও গোড়া পচা রোগ দমন প্রযুক্তি

মেথীর মূল ও গোড়া পচা রোগ মেথীর একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগ বীজ ও মাটি বাহিত। এ রোগ চারা গাছ হতে ফুল আসা পর্যন্ত হয়ে থাকে। মাটি স্যাঁতস্যাঁতে থাকলে এ রোগ বেফশ হয়ে থাকে। এ রোগ হলে গাছ আর বাঁচে না। *ফিউজারিয়াম স্পেসিস (Fusarium sp.), স্কেরোশিয়াম রফসি (Sclerotium rolfsii)* নামক ছত্রাকের কারণে এ রোগ হয়ে থাকে।

লক্ষণ

মেথীর চারা অবস্থায় গোড়া পচা রোগ পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থায় চারা গাছ হালকা হলুদ বর্ণ ধারণ করে। পরে ধীরে ধীরে গোড়া সম্পূর্ণ পচে যায়। গাছ মরে যায় ও টান দিলে সহজেই উঠে আসে। আক্রান্ত চিরলে মাঝখানে দাগ দেখা যায়।

দমন পদ্ধতি

অটোস্টিন প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম অথবা প্রোভ্যাক্স প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। আবার জমিতে রোগ দেখা দেয়ার সাথে

সাথে উক্ত ছত্রাকনাশকগুলো অটোস্টিন প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা প্রোভ্যাক্স প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ৩-৪ বার গাছের গোড়ায় স্প্রে করতে হবে। এ পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রায় ৭০% পর্যন্ত রোগ দমন করা সম্ভব।

প্রোভেক্স ট্রিটেট প্লট

অটোস্টিন ট্রিটেট প্লট

কন্ট্রোল প্লট

বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে বাঁধাকপি উৎপাদন

বাঁধাকপি Brassicaceae পরিবরের একটি গুরুত্বপূর্ন পাতা জাতীয় সবজি। বিশ্বের সর্বপ্রধান পাঁচটি সবজির মধ্যে এটি অন্যতম। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Brassica oleracea var. capitata* L. মানবপুষ্টি ও স্বাস্থের উপকারী দিক থেকে বঁধাকপির জুড়ি নেই। সবজিটিতে পানির পরিমাণ ৯৩%, সম্পৃক্ত চর্বি ও খারাপ এলডিএল (LDL) কোলষ্টেরলের পরিমাণ খুবই কম, খাবার উপযোগী আঁশের পরিমাণ বেশি। সবজিটিতে ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'সি', রিবোফ্লাভিন, থায়ামিন, ভিটামিন বি$_{৬}$, ভিটামিন 'কে', বায়োটিন, ফলিক এসিড, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ম্যাঙ্গানিজ যথেষ্ট পরিমানে আছে। এতে ক্যান্সার প্রতিরোধী ফাইটোকেমিক্যাল যেমন-গ্লুকোসিনোলেট, ইনডোল-৩-কার্বিনল, সালফোরাফেন, ডাইইনডোল মিথেন ও আইসোথায়োসায়ানেট থাকার কারনে এটা খেলে দেহে যকৃতের ক্যান্সার, প্রস্টেট ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার, ফুসফুস ক্যান্সার ও কোলন ক্যান্সার বাসা বাধতে পারে না। সবজিটিতে পটাসিয়াম ও অন্যান্য প্রধান

খনিজ লবণের উপস্থিতি ও আঁশ সমৃদ্ধতার কারণে এটা খেলে মানব দেহের হাড় মজবুত হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্যতা দূর হয়, রক্তে কোলেস্টেরোলের পরিমাণ কমে যায় এবং উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। বাঁধাকপি অ্যামাইনোএসিড গ্লুটামিন সমৃদ্ধ। গ্লুটামিন মানব শরীরে পেপটিক আলসার তৈরিতে বাঁধা প্রদান করে।

বাঁধাকপি (বৃদ্ধি পর্যায়)

চারা লাগানোর ৪৫ দিন পর ২য় বার GA_3 স্প্রে করা হচ্ছে।

হরমোন স্প্রে ব্যাতিত (কন্ট্রোল)

৫০ পিপিএম এঅ৩ স্প্রে

৭৫ পিপিএম এঅ৩ স্প্রে

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	বিবরণ
ফসল	বাঁধাকপি
জাত	অ্যাটলাস-৭০, কেকে-ক্রস, কেওয়াই-ক্রস, কৃষিবিদ বাইব্রিড-১
বীজ বপনের সময়	অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ
চারা রোপণের সময়	নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ
রোপণ পদ্ধতি	সাধারণত ৩০-৩৫ দিনের চারা ৬০ সেমি × ৪০ সেমি দূরত্বে রোপণ করতে হয়।
প্রয়োগকৃত হরমোনের মাত্রা	জিবারেলিক এসিড ৫০-৭৫ পিপিএম ; ন্যাপথ্যালিন এসিটিক এসিড ৬০ পিপিএম

বিষয়	বিবরণ
হরমোন প্রয়োগ পদ্ধতি	চারা লাগানোর ২৫ দিন পরে একবার এবং প্রথম স্প্রে করার ২০ দিন পরে অরেকবার জিবারেলিক এসিড বা ন্যাপথ্যালিন এসিটিক এসিড নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। জিবারেলিক এসিড বা ন্যাপথ্যালিন এসিটিক এসিড-এর দ্রবলের মধ্যে টুইন-২০ বা ট্রিক্স ০.০৫% হারে মিশিয়ে নিলে দ্রবণের পাতায় হরমোন লেগে থাকার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
সারের মাত্রা /হেক্টর	
ইউরিয়া	৩০০ কেজি
টিএসপি	২০০ কেজি
এমওপি	২৫০ কেজি
জিপসাম	১৫০ কেজি
বরিক এসিড	১০ কেজি
জিংক সালফেট	১২ কেজি
গোবর/কম্পোস্ট	৫ টন
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর/ কম্পোস্ট, টিএসপি, জিপসাম, বরিক এসিড ও জিংক সালফেট এর সবটুকু প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর/ কম্পোস্ট চারা রোপণের ১ সপ্তাহ পূর্বে মাদায় দিয়ে মিশিয়ে রাখতে হবে। এরপর চারা রোপণ করে চারার গোড়ায় পানি দিতে হবে। ইউরিয়া ও এমওপি সার সমান ২ কিস্তিতে উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। চারা লাগানোর ১৫ দিন পর ১ম কিস্তি এবং তার এক মাস পর ২য় কিস্তি উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
অন্যান্য অন্তর্বর্তীকলীন পরিচর্যা	আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। জমির প্রয়োজন অনুসারে সেচ প্রয়োগ করতে হবে। চারা লাগানোর পর চারার পোড়ায় ঝাঝরি দিয়ে বেশ কয়েকদিন পানি দিতে হবে। চারা মাটিতে সেট না হওয়া পর্যন্ত এভাবে পানি দিতে হবে। বাঁধাকপিতে শুষ্ক মৌসুমে ঘন ঘন সেচ দিতে হয়। মাটির প্রকৃতিভেদে ৫-৬ টি প্লাবন সেচের প্রয়োজন হয়।

বিষয়	বিবরণ
প্রযুক্তি ব্যবহারে সম্ভাব্য ফলন	৮০-৮৫ টন/হেক্টর। হরমোন প্রয়োগের ফলে হেক্টর প্রতি ১৫-২০% বেশি ফলন পাওয়া যায়।
ফসল সংগ্রহ	চারা রোপণের ৭০-৮৫ দিন পর মাথা দৃঢ় হয়ে আসলে কপি সংগ্রহ করা যায়। কোনো কোনো জাতের মাথা পরিণত হওয়ার সময় ফেটে যায়। এসব জাত সংগ্রহে দেরি করা উচিৎ নয়।
খরচ ও নিট মুনাফা	প্রতি হেক্টরে প্রায় ১.৩০ থেকে ১.৩৫ লক্ষ টাকা খরচ করে নিট মুনাফা প্রায় ৩.০ থেকে ৪.০ লক্ষ টাকা আয় করা যায়। হেক্টর প্রতি বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক রাসায়নিক দ্রব্যের জন্য খরচ হয় ৮০০০.০০ থেকে ৯০০০.০ টাকা। প্রতি শতাংশে বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রব রাসায়নিক দ্রব্যসহ ৫০০.০০ থেকে ৬০০.০০ টাকা খরচ করে ১২০০.০০ তেকে ১৫০০.০০ টাকা আয় করা যায়।

বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে করলা উৎপাদন

করলা Cucurbitaceae গোত্রভুক্ত বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় সবজি। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Momordica charantia* L.। এটি উষ্ণ মণ্ডল ও অব-উষ্ণ মণ্ডলীয় অঞ্চলের ফসল। ইহা উষ্ণ ও শুস্ক জলবায়ুতে ভাল জন্মে। বারি করলা-১, বারি করলা-২ এবং বারি করলা-৩ জনপ্রিয় করলার জাত।

বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে করলা উৎপাদন

মানবপুষ্টি ও স্বাস্থের উপকারী দিক থেকে করলার জুড়ি নেই। সবজিটিতে পানির পরিমাণ ৯৩%, সম্পৃক্ত চর্বি ও কোলেষ্টেরলের পরিমাণ খুবই কম। এতে ভিটামিন 'সি',

ভিটামিন 'এ', রিবোফ্লাবিন, আয়রন ও ক্যালসিয়াম যথেষ্ট পরিমাণে আছে। করলাতে 'স্যাপোটেনিন' নামক রাসায়নিক উপাদান থাকায় ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ইহা একটি উত্তম সবজি। 'কিউকারবিটাসিন' ও 'মোমোরডিসিন' রাসায়নিক উপাদান থাকার কারনে করলার পাতা ও ফল তিতা স্বাদ যুক্ত হয়। করলার পাতা ও ফলে বিষাক্ত কোনো 'কিউকারবিটাসিন' না থাকার কারনে সবজিটি মানুষের জন্য নিরাপদ। Cucurbitaceae গোত্রের করলা ব্যাতিত অন্যান্য সবজি (শশা, লাউ, ধুন্দল প্রভৃতি) তিতা স্বাদ যুক্ত হলে সেগুলো খাওয়া থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা এগুলোতে বিষাক্ত 'কিউকারবিটাসিন' থাকে। বিষাক্ত 'কিউকারবিটাসিন' যুক্ত সবজি খেলে কিডনি বিকল হয়ে মানুষ মারা যেতে পারে।

NAA ব্যাতিত (কন্ট্রোল)

২০০ পিপিএম NAA স্প্রে

বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাব

উদ্ভিদ শারীরতাত্বিক প্রক্রিয়া পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রনে উদ্ভিদ বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক রাসায়নিক দ্রব্যাদির (Plant Growth Regulators) ভূমিকা সর্বজন বিদিত। সাধারণতঃ করলা গাছে পুরুষ ফুলের সংখ্যা স্ত্রী ফুলের চেয়ে বেশি হয়। গ্রীষ্মকালের লম্বা দিবা দৈর্ঘ্য ও প্রখর আলো করলার পুরুষ ফুলের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়, পরিণতিতে স্ত্রী ফুলের সংখ্যা কমে যায়। স্ত্রী ফুলের সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে ফলের সংখ্যা কমে যায় এবং ফলশ্রুতিতে হেক্টরপ্রতি ফলন কমে যায়। বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক দ্রব্য (জিবারেলিক এসিড- GA_3 ও ন্যাপথ্যালিন এসিটিক এসিড-NAA) ব্যাবহার করলে পুরুষ ফুলের সংখ্যা কমে যায় এবং স্ত্রী ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। GA_3 ও NAA প্রয়োগে প্রতিটি ফলের ওজনও বৃদ্ধি পায়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

উৎপাদন মৌসুমঃ বীজ বপনের সময় ফেব্রুয়ারি-মার্চ।

জমি তৈরি ও বীজ বপনঃ প্রথমে জমি ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করতে হবে। তারপর নির্দিষ্ট দূরত্বে মাদা তৈরি করতে হবে, মাদা ১৫ সে.মি. উঁচু হওয়া

বাঞ্ছনীয়। পাশাপামি দুটো মাদার মধ্যে দু'মিটার দূরত্ব রাখতে হবে। করলার বীজের খোসা বেশী শক্ত বিধায় বপনের পূর্বে বীজ ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখলে অঙ্কুরোদ্গম তরান্বিত হয়। জিবারেলিক এসিড (GA_3) এর ১০ পিপিএম দ্রবণে বীজ ১২-১৮ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি অঙ্কুরোদ্গম হয়। বীজ সরাসরি মাদায় বপন করা যায়। প্রতি মাদায় ৫-৬ টি বীজ লাগাতে হয়। পরে মাদা প্রতি ২ টি চারা রেখে দিতে হয়। আবার বীজ পলিব্যাগে অথবা প্লাস্টিক পটে তৈরি করে নেয়া যায়। ২-৩ পাতা বিশিষ্ট চারা (১৪-১৬ দিন বয়স্ক) মাঠে প্রতি মাদায় ২ টি করে লাগাতে হয়। বীজ অথবা চারা সারি করেও লাগানো যায়। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২.০ মিটার এবং চারা থেবে চারার দূরত্ব হবে ১.০ মিটার।

বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক দ্রব্য, তার মাত্রা ও প্রয়োগঃ ন্যাপথ্যালিন এসিটিক এসিড (NAA) করলার ফলন বৃদ্ধির জন্য খুবই কার্যকরী বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক দ্রব্য। NAA ১৫০-২০০ ppm নিদিষ্ট মাত্রায় নিদিষ্ট বয়সের চারায় স্প্রে করতে হবে। করলার চারা ১৪-১৫ দিন পরে ২ পাতা বিশিষ্ট হলে NAA প্রয়োগ করতে হবে। পরে চার থেকে ছয় দিন পরে একই হরে ঐ বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক দ্রব চারার পাতায় প্রয়োগ করতে হবে।

সারের পরিমান ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সারের নাম	পরিমাণ (প্রতি হেক্টর)
গোবর/কম্পোস্ট	৫ টন
ইউরিয়া	২৬০ কেজি
ট্রিপল সুপার ফসফেট (টিএসপি)	২০০ কেজি
মিউরিয়েট অব পটাশ (এমওপি)	১৬০ কেজি
জিপসাম	১৬৫ কেজি
জিংক সালফেট	১১ কেজি
বোরিক এসিড	১২ কেজি

গোবর/কম্পোস্ট, টিএসপি, জিপসাম, জিংকসালফেট ও বোরিক এসিড এর সবটুকু এবং ইউরিয়া ও এমওপি এ দুটি সারের তিনভাগের এব ভাগ মাদায় প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া ও এমওপি সার দুটি চারা লাগানোর ২০ দিন পর থেকে সমান ৪-৫ কিস্তিতে ২০ দিন পর পর মাদা (চারা)'র চারপাশে মাটির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

অন্যান্যো পরিচর্যাঃ বাউনী দেয়া করলার প্রধান পরিচর্যা। বাধাহীনভাবে বাইতে না পারলে করলার গাছে ফলনশীলতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। তাই করলায় বাউনী দেয়া প্রয়োজন। বাঁশ ও কঞ্চির সাহায্যে অথবা অন্য উপায়েও বাউনী দেয়া যেতে পারে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনঃ করলার গাছ চারা অবস্থায় রেড পামকিন বীটল ও এপিলাকনা বীটল দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ পোকাদ্বয় দমনের জন্য সেভিন/কার্বারিল-৮৫ ডব্লিইপি ২ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে ৭ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। গাছে ফল আসার সময় ফলের মাছি পোকার উপদ্রব মারাত্মক আকারে দেখা দেয়। সেক্স ফেরোমেন ও বিষটোপের যৌথ ব্যাবহারে এ পোকার অক্রমণ থেকে ফসলকে রক্ষা করা যায়। বিষটোপের জন্য থেতলানো ১০০ গ্রাম মিষ্টি কুমড়ার সাথে ০.২৫ গ্রাম সেভিন/কার্বারিল-৮৫ ডব্লিইপি পাওডার মিশিয়ে ব্যাবহার করতে হয়। বিষটোপ ৩-৪ দিন পরপর পরিবর্তন করতে হয়। সেক্স ফেরোমেন স্ট্রিপ 'কিউ ফেরো' নামে বাজারে পাওয়া যায়। ফেরোমেন স্ট্রিপ ফাদে ঝুলিয়ে ফাদের নিচে সাবান মিশ্রিত পানি রাখলে ফেরোমেনের গন্ধে পুরুষ পোকা আকৃষ্ট হয়ে সাবান মিশ্রিত পানিতে পড়ে মারা যায়।এতে ফলের মাছি পোকার অক্রমণ বহুলাংশে কমে যায়।

ফলনের ওপর বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক দ্রব্যের প্রভাবঃ ন্যাপথ্যালিন এসিটিক এসিড (NAA) ব্যাবহার করলে পুরুষ ফুলের সংখ্যা কমে যায় এবং স্ত্রী ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ও প্রতিটি ফলের ওজন বৃদ্ধি পায় এবং করলার ফলন বাড়ে। বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক দ্রব্য সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে প্রতিটি করলা গাছে ফলের সংখ্যা ৩০-৩৫% কৃাদ্ধ পায় । এতে ফলন প্রায় ২৫%-৩০% বৃদ্ধি পায়।

খরচ ও নিট মুনাফাঃ প্রতি হেক্টরে প্রায় ২.৩০ লক্ষ টাকা খরচ করে নিট মুনাফা প্রায় ৫ লক্ষ টাকা আয করা যায়। হেক্টর প্রতি ন্যাপথ্যালিন এসিটিক এসিড (NAA) এর জন্য খরচ হয় ৫০০০.০০- ৬০০০.০ টাকা। প্রতি শতাংশে ১০০০.০০ টাকা খরচ করে ২০০০.০০ টাকা আয় করা যায়।

হালকা বুনটের মাটির জন্য লাভজনক ফসল-ধারাঃ আগাম আলু-গম-মুগডাল-আমন ধান

ভূমিকাঃ বাংলাদশে একদিকে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে বাড়ছে জনসংখ্যা। তাই বাড়তি জনগোষ্ঠীর খাদ্য যোগান দেয়ার জন্য অল্প জমিতে বেশি ফসল ফলানোর বিকল্প নেই। অধিক খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজনে একই জমিতে বেশি শস্য আবাদের কারণে অনেক ক্ষেত্রে জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে। জমির উর্বরতা ঠিক রেখে একই জমিতে বছরে ৩টির জায়গায় ৪টি ফসল ফলাতে পারলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকের আয় ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে রংপুর বিভাগের বেশির ভাগ জমি উঁচু এবং মাটি বেলে-দোআঁশ প্রকৃতির। এ মাটির পানি-নিষ্কাষণ খুব ভালো হওয়ায় এবং শীতকালের আগেই তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় আগাম আলু উৎপাদন করা সম্ভব। আগাম আলুর ভালো দাম পাওয়া যায় বলে এ অঞ্চলের বেশ কিছু সংখক কৃষক অক্টোবর মাসের মধ্যে আলু বীজ রোপণ করে। আগাম আলু রোপণ করতে হবে বলে অনেক সময় আমন মৌসুমে জমি পতিত থাকে। অথচ স্বল্প-মেয়াদী জাতের আমন ধানের চাষ করেও আগাম আলু উৎপাদন করা সম্ভব। খরিফ-২ মৌসুমে যেমন বেশির ভাগ কৃষক আমন ধান আবাদ করে তেমনি আগাম আলু আবাদ করার পর ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলার কিছু সংখক কৃষক গমের আবাদ করে। গমের পরে খরিফ-১ মৌসুমে অল্প খরচে স্বল্প-মেয়াদী জাতের মুগডাল আবাদ করা সম্ভব। মুগডাল আবাদে আমিষের চাহিদাপূর্ণ হবে এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে। আগাম আলু, তাপসহিষ্ণু জাতের গম, স্বল্প-মেয়াদী জাতের মুগডাল এবং স্বল্প-মেয়াদী জাতের আমনধান- এই ৪টি ফসল গম গবেষণা কেন্দ্র, নশিপুর, দিনাজপুরে একই জমিতে পর পর ৪ বছর সফলভাবে আবাদ করা হয় এবং আগাম আলু-গম-মুগডাল-আমনধান ফসল-ধারাটি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদের জন্য সুপারিশ করা হয়।

প্রযুক্তির বিবরণঃ একই জমিতে বছরে ৪ টি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। আগাম আলু লাগানোর জন্য আমন মৌসুমে (খরিপ-২) স্বল্প-মেয়াদীজাত যেমন বিনা ধান- ৭ বা ১৫ অথবা ব্রি ধান ৫৬, ৫৭ বা ৬২ অথবা ব্রি হাইব্রিড ধান ৪ লাগাতে হবে। আমন ধান কাটার পর ১৫-২০ অক্টোবরে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় এমন আলুর জাত যেমন গ্রানোলা বাসাগিতা লাগাতে হবে এবং ৬০ দিন পর আলু উত্তোলন করতে হবে। আলু উত্তোলনের পর পরই গম বপন করতে হবে।

প্রযুক্তি হতেফলনঃ এই ফসল-ধারায় বছরে গড়ে ১৯.৫৭ টন গমের সমতুল্য ফলন পাওয়া যায় এবং গড়ে ১,৯০,০০০ টাকা খরচ করে ১,৬০,০০০ টাকা লাভকরা সম্ভব।

প্রয়োগের স্থানঃ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হালকা বুনটের মাটিতে এই ফসল-ধারা খুবই উপযোগী। যেখানে ঘনঘন সেচ দিয়ে বোরো চাষ খুব একটা লাভজনক নয়, সেখানে এই ফসল-ধারা বেশ লাভজনক।

গোলআলু (গ্রানোলা) গম (বারি গম ২৫) মুগডাল (বারিমুগ ৬) আমনধান (বিনাধান ৭)

গম-ভুট্টা-আমনধান ফসলধারায় স্বল্পচাষ ও মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদনবৃদ্ধি

ভূমিকাঃ পাওয়ারটিলার চালিত বপন যন্ত্রের (PTOS) সাহায্যে এক চাষে গম, গমের পরে বিনাচাষে ভুট্টা অতপর আমনধান চাষ একটি লাভজনক কৃষি প্রযুক্তি। গমের সবগুলো আধুনিক জাত যেমন- বারিগম-২৫, বারি গম- ২৬, বারি গম-২৮, বারি গম-৩০, ভুট্টার হাইব্রিড জাত যেমন বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১১, এন কে ৪০ এবং ধানের স্বল্প মেয়াদি জাত যেমন বিনা ধান-৭, ব্রি ধান ৫৬, ৫৭ এই ফসল ধারায় সফলভাবে চাষ করা যায়। গম ও ভুট্টা বপনের ক্ষেত্রে পাওয়ার টিলার চালিত বপন যন্ত্রের ব্যবহার জমিতে ফসলের অবশিষ্টাংশ প্রয়োগে এবং জমি তৈরির সময় কমাতে সহায়ক।

প্রযুক্তির বিবরণঃ সাধারণভাবে গম ও ভুট্টা শস্য দু'টি রবি মৌসুমে আবাদ করা হয় এবং শস্য প্রতিযোগিতায় উভয়েরই আবাদি জমির পরিমাণ কমে যায়। ভুট্টা ফসলটিকে গম-ভুট্টা-আমনধান ফসল ধারায় রবি থেকে খরিফ মৌসুমে স্থানান্তর করে গমের আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধিসহ শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা সম্ভব। নিবিড় এই ফসল ধারায় জমির উর্বরতা সংরক্ষণে সুষম সারের প্রয়োগ ও মাটির ব্যবস্থাপনা যেমন স্বল্প চাষ, শস্যের অবশিষ্টাংশ জমিতে প্রয়োগ দীর্ঘ মেয়াদী সুফল পাওয়ার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। আমন ধান কাটার সময় গোড়ায় না কেটে ২০-৩০ সে. মি. উপরে কর্তন করতে হবে। জমির 'জোঁ' অবস্থায় গমের জন্য অনুমোদিত মাত্রার সার ছিটিয়ে দিয়ে বপন যন্ত্রের সাহায্যে এক চাষে ৬ সারিতে বীজ বপন করা যায়। একই ভাবে গম ফসল সংগ্রহের সময় শস্য গোড়া থেকে ২০-৩০ সে. মি. উপরে কর্তন করতে হবে এবং বিনা চাষে ভুট্টা বপন করতে হবে। এইভাবে গম ও ভুট্টা চাষে জমিতে জৈব পদার্থ যোগ হয়, ভূমির উর্বরতা এবং মাটির পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

প্রযুক্তি হতেফলন: প্রযুক্তিটির ব্যবহারে জমি চাষ খরচ কম হওয়ায় ফসলের উৎপাদন ব্যয় কমে এবং মোট উৎপাদন বাড়ায় কৃষকের আয় বৃদ্ধি পায়। শস্যের অবশিষ্টাংশ মাটিতে যোগ হওয়ায় মাটির ভৌত অবস্থা উন্নত হয়, উর্বরতা বাড়ে ফলে গম-ভুট্টা-ধান ফসলধারায় প্রত্যেকটি শস্যের ফলন বৃদ্ধি পায়। প্রযুক্তিটি ব্যবহারে গমের ৪.০-৫.১ টন/হেক্টর, ভূট্টার ৬.২-৭.০ টন/হেক্টর এবং ধানের ৫.১-৬.০ টন/হেক্টর ফলন পাওয়া যায়।

প্রয়োগের স্থান: দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সকল গম আবাদ উপযোগী উচু/মাঝারী উচুজমিতে এ প্রযুক্তিটি সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ফলজ ও বনজ বৃক্ষের জায়ান্ট মিলিবাগ দমন ব্যবস্থাপনা

সম্প্রতি বাংলাদেশে জায়ান্ট মিলিবাগ বিভিন্ন ফলজ ও বনজবৃক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক পোকা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। এই পোকা বিভিন্ন ফলজ উদ্ভিদ যেমন- কাঁঠাল, আম, লেবু, নারিকেল এবং বনজ বৃক্ষ যেমন- রেইন ট্রি, কড়ই গাছে আক্রমণ করে। স্ত্রী নিম্ফ পোকা পুষ্পমঞ্জুরী, কচি পাতা, শাখা প্রশাখা ও ফলের বোঁটা থেকে রস শোষণ করে ফলে গাছের আক্রান্ত অংশ শুকিয়ে যায় যা ফল ধরার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং অনেক ফল ঝরে যায়। বিগত ২০১৪ সনে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও গার্হস্থ অর্থনীতি কলেজের বৃক্ষ সমূহে এই পোকার ব্যপক আক্রমণ পরিলক্ষিত হয় যা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বর্তমানে দেশের উত্তরাঞ্চলসহ বিভিন্ন অংশে এ পোকার ব্যপক প্রার্দুভাব দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞানীগণ এ পোকা দমনে একটি সহজ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে পোকা ব্যপকভাবে ছড়িয়ে যাবার পূর্বেই অতি সহজেই একত্রে মেরে ফেলা যায় অন্যদিকে এটি অত্যন্ত কার্যকরি, সহজ ও অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী।

সাধারণত আক্রমনের সময়ানুযায়ী ২টি পদ্ধতিতে এ পোকা দমন করা যায়, ১) মার্চ-এপ্রিল মাসে পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী পোকা ধংস্ব করা এবং ২) নভেম্বর মাসে সদ্য প্রস্ফুটিত নিম্ফ ধ্বংস করা।

দমন পদ্ধতি ১: মার্চ- এপ্রিল মাসে পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী পোকা ধংস্ব করা: এপ্রিল-মে মাসে পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী পোকাগুলি মাটিতে ডিম পাড়ার জন্য দলবদ্ধভাবে গাছ থেকে মাটিতে নেমে আসে তখন এরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ হতেই গাছের গোড়ায় মাটি থেকে ১ মিটার উচুঁতে ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া প্লাষ্টিকের পিচ্ছিল ব্যান্ড (র‍্যাপিং টেপ) গাছের চতুর্দিকে আবৃত করে দিলে এরা উপর থেকে নেমে আসতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনেক সময় প্লাষ্টিকের পিচ্ছিল ব্যান্ড এর উপরের

অংশে স্ত্রীপোকাসমূহ জমা হয়। এ অবস্থায় এদের সহজেই পিটিয়ে বা একসাথে করে আগুনে পুড়িয়ে মারা সম্ভব অথবা জমাকৃত পোকার উপর সংস্পর্শ কীটনাশক স্প্রে করে দমন করা যায়। যেহেতু এ পোকাটির বহিরাবরন ওয়াক্সি পাউডার জাতীয় পদার্থ দিয়ে সুরক্ষিত থাকে সেহেতু পরীক্ষিত কীটনাশক ছাড়া এটি দমন করা দূরহ। এ ক্ষেত্রে প্রথমে ক্লোরপাইরিফস (ডারসবান ২০ ইসি বা এ জাতীয় কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ৩ মিলি হারে) এবং তার ২-৩ দিন পর কার্বারাইল জাতীয় কীটনাশক (সেভিন ৮৫ এসপি বা মিপসিন ৭৫ ডব্লিউপি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে) আক্রান্ত অংশে স্প্রে করতে হবে। প্রতি ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার এভাবে স্প্রে করলে এ পোকা সম্পূর্ণভাবে দমন করা সম্ভব।

দমন পদ্ধতি ২: নভেম্বর মাসে সদ্য প্রস্ফুটিত নিম্ফ ধ্বংস করা। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ হতেই নিম্ফ সমূহ গাছ বেয়ে উপরে উঠে তাই উক্ত সময় গাছের গোড়ায় মাটি থেকে ১ মিটার উঁচুতে ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া প্লাষ্টিকের পিচ্ছিল ব্যান্ড (র‍্যাপিং টেপ) গাছের চতুর্দিকে আবৃত করে দিলে এরা বার বার উঠার ব্যর্থ চেষ্টা করে পরিশ্রান্ত হয়ে মারা যায়। অনেক সময় প্লাষ্টিকের পিচ্ছিল টেপ এর নিচের অংশে নিম্ফ সমূহ জমা হয়। এ অবস্থায় এদের সহজেই পিটিয়ে বা একসাথে করে আগুনে পুড়িয়ে মারা সম্ভব অথবা জমাকৃত পোকার উপর সংস্পর্শ কীটনাশক স্প্রে করে দমন করা যায়। ব্যান্ডের নিচে একত্রিত নিম্ফসমূহকে মেরে ফেলার জন্য কার্বারিল (সেভিন) ৮৫ এসপি প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। এসময় নিম্ফ সমূহকে গাছে উঠা হতে নিবৃত করতে পারলে এ পোকার আক্রমণ পুরোপুরিভাবে দমন করা সম্ভব।

গাছের কাণ্ডে বাইন্ডিং টেপ

বাইন্ডিং টেপের নিচে জায়েন্ট মিলিবাগের নিম্ফ

বাইন্ডিং টেপের নিচে স্প্রে করে মিলিবাগ দমন

আমের ফুল ও ফল ঝরা রোধে টেকসই ব্যবস্থাপনা

আম একটি জনপ্রিয় ফল। সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে আমের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সঠিক সময়ে ও মাত্রায় সার, সেচ, পোকামাকড়, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা না করায় আমের ফুল ও ফল ঝরে যায় এবং সামগ্রিক ভাবে আমের উৎপাদন ব্যহত হয়। আম উৎপাদনকারী বাংলাদেশের ১৪টি জেলার ২০টি উপজেলায় কৃষক পর্যায়ে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আমের ফুল ও ফল ঝরা রোধের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির সমন্বিত প্যাকেজ উদ্ভাবন করা হয়েছে যা নিম্নরুপ:

- ফসল সংগ্রহের পর আগস্ট মাসে রোগক্রান্ত মরা ও অপ্রয়োজনীয় ডালপালা, শাখা প্রশাখা এবং পরগাছা ছেটে গাছে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ হতে নিম্নে বর্ণিত উপায়ে সার প্রয়োগ করতে হবে।
- আমের মুকুল আসার ৭-১০ দিনের মধ্যে অথবা মুকুলের দৈর্ঘ্য ১ থেকে দেড় ইঞ্চি হলে (অবশ্যই ফুল ফুটে যাবার আগে) আমের হপার পোকা দমনের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড (কনফিডর) ৭০ ডব্লিউ জি বা অন্য নামের অনুমোদিত কীটনাশক

সুস্থ আমের মুকুল

হপার আক্রান্ত আমের মুকুল

পোকা আক্রান্ত আমবিহীন মুকুল

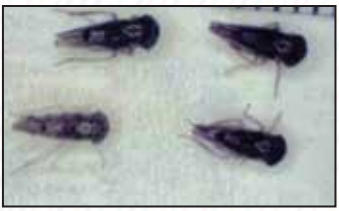

আমের হপার পোকা

প্রতি লিটার পানিতে ০.২ গ্রাম হারে অথবা সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড) ১০ ইসি বা অন্য নামের অনুমোদিত কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে বা অন্যান্য অনুমোদিত কীটনাশক এবং এথ্রাকনোজ রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ইন্ডোফিল) এম-৪৫ নামক বা অন্যান্য অনুমোদিত ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে একত্রে মিশিয়ে আম গাছের মুকুল, পাতা, শাখা প্রশাখা ও কাণ্ডে ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। এরপর ৪-৫ সপ্তাহের মধ্যে আম মটরদানা আকৃতির হলে একই ধরনের কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক উল্লিখিত মাত্রায় একত্রে মিশিয়ে মুকুল পাতা ও কাণ্ড ও শাখা প্রশাখা ভিজিয়ে আর একবার স্প্রে করতে হবে। আম গাছে হপার পোকা এবং এথ্রাকনোজ রোগের হাত থেকে মুকুল রক্ষা করার জন্য উপরোক্ত পদ্ধতিতে ২ (দুই) বার কীটনাশক এবং ছত্রাকনাশকের একত্রে প্রয়োগ করাই যথেষ্ট।

- আম গাছে ভরা মুকুলের (Full bloom) সময় থেকে শুরু করে ১৫দিন অন্তর আম গাছের গোড়ায় ৪ বার সেচ দিতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগঃ চারা রোপণের পর গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছ বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বয়স ভিত্তিতে গাছ প্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেখানো হলো।

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)					
	১-৪	৫-৭	৮-১০	১১-১৫	১৬-২০	২০-এর উর্দ্ধে
গোবর (কেজি)	২৬.২৫	৩৫	৪৩.৭৫	৫২.৫০	৭০	৮৭.৫০
ইউরিয়া (গ্রাম)	৪৩৭.৫০	৮৭৫	১৩১২.৫০	১৭৫০	২৬২৫	৩৫০০
টিএসপি (গ্রাম)	৪৩৭.৫০	৪৩৭.৫০	৮৭৫	৮৭৫	১৩১২.৫০	১৭৫০
এমওপি(গ্রাম)	১৭৫	৩৫০	৪৩৭.৫০	৭০০	৮৭৫	১৪০০
জিপসাম (গ্রাম)	১৭৫	৩৫০	৪৩৭.৫০	৬১২.৫০	৭০০	৮৭৫
জিংক সালফেট (গ্রাম)	১৭.৫০	১৭.৫০	২৬.২৫	২৬.২৫	৩৫	৪৩.৭৫
বরিক এসিড	৩৫	৩৫	৫২.৫০	৫২.৫০	৭০	৮৭.৫০

প্রয়োগ পদ্ধতিঃ বয়স ভেদে নির্ধারিত সম্পূর্ণ পরিমাণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং বরিক এসিড এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও অর্ধেক এমওপি সার সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমওপি সার সমান দুই ভাগ করে এক ভাগ মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে যখন ফল মটর দানার মত

হয় তখন এবং অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমওপি সার মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে প্রয়োগ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, গাছের চারিদিকে গোড়া থেকে কমপক্ষে ১ থেকে ১.৫ মি. দূরে হালকাভাবে কুপিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বেশি হলে এই দূরত্ব বাড়তে পারে। সার প্রয়োগের পর হালকা সেচ দিতে হবে।

সবজি থেকে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ সংক্রমণমুক্তকরণ

শাকসবজি মানবদেহের প্রয়োজনীয় জৈবরাসায়নিক পুষ্টি উপাদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এতে রয়েছে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম ও আয়রনসহ মানবদেহের জন্য অপরিহার্য খনিজ পদার্থ। উন্নয়নশীল দেশের জন্য শাকসবজি শক্তির মৌলিক উৎস হিসেবে কাজ করে। এটি স্বাস্থ্যের জন্য যেমন অত্যন্ত উপকারী, তেমনি খাদ্য ও আর্থিক নিরাপত্তার জন্যও অত্যধীক গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ুগত কারণে বাংলাদেশে চাষকৃত শাকসবজিতে বিভিন্ন কীটপতঙ্গ ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে থাকে। কৃষকরা মানসম্মত সবজির ফলন বৃদ্ধি ও বিনিয়োগের উপর ভালো লাভ পেতে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে কীটনাশক ব্যবহার করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অজ্ঞতার কারণে কৃষকগণ ব্যাপকভাবে কীটনাশক ব্যবহার করে থাকেন এবং সর্বশেষ স্প্রে ও ফসল তোলার মধ্যে সময়ের উপযুক্ত ব্যবধান মেনে চলেন না । যার ফলে বাজারের সবজির নমুনাতে অহরহ কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশের পরিমাণ মানবদেহের সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেশি থাকে, যা স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরুপ। ফলে, জীবন রক্ষাকারী পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ সবজি হয়ে ওঠে জীবনঘাতী কীটনাশকের অবশিষ্টাংশের বাহক। যা নিয়মিত গ্রহণের মাধ্যমে মানবদেহের বিভিন্ন অংশে কীটনাশকের দীর্ঘস্থায়ী বিষক্রিয়া হয়, যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় বিভিন্ন জীবনঘাতী ব্যাধী যেমন: ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, কিডনীর বিভিন্ন রোগ ইত্যাদি। ভোক্তা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শাকসবজি থেকে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ অপসারণ জরুরি। এবং এই অপসারণ হতে হবে বাড়িতে তথা রান্নাঘরে সহজলভ্য উপাদান দ্বারা।

শাকসবজি থেকে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ অপসারণ তথা সংক্রমণমুক্তকরণ কয়েক পদ্ধতিতে রান্নাঘরে সহজলভ্য কিছু উপাদান দ্বারা সহজেই করা যেতে পারে। উপাদানগুলো হলো খাবার লবণ, গুঁড়া সাবান, হলুদ গুড়া প্রভৃতি। বেগুন, শিম, টমেটো, শসা এবং কাঁচা মরিচ হতে অর্গানোফসফরাস কীটনাশকের যথা- ক্লোরোপাইরিফস, কুইনালফস, ফেনিট্রোথিয়ন, ম্যালাথিয়ন এবং ডায়াজিননের অবশিষ্টাংশ অপসারণের জন্য নিম্নে কিছু পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

খাবার লবণ দ্বারা: বাজার থেকে কিনে আনা সবজি পরিষ্কার পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে ⟶ প্রতি লিটার পানিতে ২০ গ্রাম হারে লবন যোগ করে লবণপানি তৈরি করতে হবে ⟶ তৈরিকৃত লবণপানিতে সবজি ১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে ⟶ পরিষ্কার পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে ⟶ পরিমিত তাপে রান্না করতে হবে।

এই পদ্ধতিতে ৮৬% পর্যন্ত অর্গানোফসফরাস কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ অপসারণ হয়।

হলুদ গুঁড়া দ্বারা: বাজার থেকে কিনে আনা সবজি পরিস্কার পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে ⟶ প্রতি লিটার পানিতে ১০ গ্রাম হারে হলুদ গুড়া যোগ করে দ্রবণ তৈরি করতে হবে ⟶ তৈরিকৃত হলুদ দ্রবণে সবজি ১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে ⟶ পরিষ্কার পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে ⟶ পানিতে ১৫ মিনিট রান্না করতে হবে।

এই পদ্ধতিতে ৭১% পর্যন্ত অর্গানোফসফরাস কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ অপসারন হয়।

এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাজার থেকে সংগ্রহ করা বিভিন্ন সবজিসমূহের কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ সংক্রমণমুক্ত করণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি সহজলভ্য করা সম্ভব।

সবজি থেকে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ সংক্রমণ মুক্তকরণ

আকর্ষণ ও মেরে ফেলা পদ্ধতির মাধ্যমে কুমড়া জাতীয় ফসলের মাছি পোকা দমন

কুমড়া জাতীয় প্রায় ১৬টি সবজি, যেমন মিষ্টি কুমড়া, লাউ, করলা, কাকরল, চাল কুমড়া, ঝিঙ্গা, চিচিংগা, ধুন্দুল, পটল, তরমুজ ইত্যাদির ফলে মাছি পোকার আক্রমণ ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। মুলত মাছি পোকার কীড়া ফলের ভিতরে ঢুকে ক্ষতি করে থাকে বিধায় কীটনাশক ব্যবহার করে এই পোকা দমন করা খুবই কঠিন। আম, পেয়ারা ইত্যাদি ফসলের মাছি পোকা দমনের আর্কষণ করে মেরে ফেলা পদ্ধতির অনূরূপ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞানীগণ অতি সম্প্রতি কুমড়া জাতীয় সবজির মাছি পোকা দমনের একটি সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। ইতোপূর্বে ফেরোমন ফাঁদ ভিত্তিক দমন ব্যবস্থাপনায় শুধুমাত্র পুরুষ মাছি পোকাকে আকৃষ্ট হয়ে মারা যেতো। কিন্তু নতুন এই পদ্ধতির মাধ্যমে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় পোকা আকৃষ্ট হয়ে মারা যায়। পুরুষ মাছি পোকা আকর্ষণ করার জন্য কিউলিউর ফেরোমন ও জৈব বালাইনাশক মিশ্রিত জেল বা পেস্টের মতো একটি পদার্থ বাগানের সীমানা লাইনে অবস্থিত গাছের লতানো কাণ্ডে বা মাচার বাঁশে (মাটি হতে ২-৩ ফুট উপরে) ১০-১২ মিটার দূরে দূরে অল্প পরিমাণে লাগিয়ে দিতে হবে। এই ভাবে সারা বাগানের সীমানা লাইনেকিউলিউর ফেরোমন ও জৈব বালাইনাশক মিশ্রিত জেল লাগিয়ে দেওয়ার ফলে অন্য বাগানেরসহ ঐ বাগানেরও পুরুষ মাছি পোকাসমূহ সীমানা লাইনের গাছে পেস্টের মধ্যে আকৃষ্ট হয়ে মারা যাবে। স্ত্রী মাছি পোকাকে আকৃষ্ট করে মেরে ফেলার জন্য বাগানের ভিতরের গাছ গুলিতে ১০-১২ মিটার দূরে দূরে জৈব বালাইনাশক মিশ্রিত এক প্রকার পোকার খাবার সহ একটি ফাঁদ গাছের ডালে ঝুলিয়েদিতে হবে। এর ফলে বাগানের ভিতরে থাকা সকল স্ত্রী পোকা খাবারের লোভে আকৃষ্ট হয়ে ফাঁদের কাছে ছুটে যাবে এবং মারা যাবে। এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে অল্প খরচে এবং পরিবেশ সম্মত উপায়ে কুমড়া জাতীয় ফসলের মাছি পোকা কার্যকরীভাবে দমনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

করলা গাছে পুরুষ পোকা আকৃষ্টকরণ জেল

করলা গাছে স্ত্রী মাছি পোকার ফাঁদ

জৈব বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিমের প্রধান ক্ষতিকর পোকা (মাজরা ও জাব পোকা) দমন

জাব ও বিভিন্ন মাজরা পোকা শিমের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে থাকে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত নিম্নোক্ত জৈব বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত পোকাসমূহ দমন করা সম্ভব।

- প্রাথমিক অবস্থায় আক্রান্ত পাতা ও ডগার জাব পোকা হাত দিয়ে পিষে মেরে ফেলা যায়। ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানি (প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫ গ্রাম গুড়া সাবান মেশাতে হবে) স্প্রে করেও এ পোকার আক্রমণ অনেকাংশে কমানো যায়। এছাড়াও আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে আক্রান্ত স্থানে বায়োনিম প্লাস ১মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর অন্তর ২-৩ বার স্প্রে মাধ্যমে এ পোকা সহজে দমন করা যায়।

মাজরা পোকা আক্রান্ত শিমের ফুল

মাজরা পোকা আক্রান্ত শিমের ফুল ও ফল

- যান্ত্রিক উপায়ে দমন: সাধারণত মাজরা পোকা শিমের ফুল ও পরবর্তীকালে ফলে আক্রমণ করে থাকে। গবেষণায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, এক দিন পর পর আক্রান্ত ফুল ও ফল হাত বাছাই করে ধ্বংস করে ফেললে এই পোকা অনেকাংশে দমন করা সম্ভবপর হয়।

- উপকারী পোকামাকড় অবমুক্তকরণ: প্রতি সপ্তাহে একবার করে ডিম নষ্টকারী পরজীবী পোকা, *ট্রাইকোগ্রামা কাইলোনিজ* (হেক্টরপ্রতি এক গ্রাম পরজীবী পোকা আক্রান্ত ডিম, যেখানে থেকে ৪০,০০০ হতে ৪৫,০০০ পূর্ণাঙ্গ *ট্রাইকোগ্রামা* বের হয়ে আসবে) ও কীড়া নষ্টকারী পরজীবী পোকা, *ব্রাকন হেবিটর* (হেক্টরপ্রতি এক বাংকার বা

জাব পোকা আক্রান্ত শিমের ডগা

৮০০-১২০০টি পূর্ণাঙ্গ পোকা) পর্যায়ক্রমিকভাবে শিমের জমিতে মুক্তায়িত করতে হবে।

- বিষাক্ত কীটনাশকের প্রয়োগ বন্ধ বা সীমিত ব্যবহার: একান্ত প্রয়োজনে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে কেবলমাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন জৈব কীটনাশক (স্পাইনোসেড ৪৫এসসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৪ মিলি হিসাবে) ব্যবহার করা যেতে পারে।
- এলাকা ভিত্তিক সমন্বিত উদ্যোগ: উল্লেখিত পদ্ধতিটির সামগ্রিক সফলতার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল শিম চাষীদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ খুবই জরুরি।

বেগুনের বিভিন্ন ধরনের শোষক পোকার সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

বেগুন বাংলাদেশের একটি অন্যতম জনপ্রিয় সবিজ যা সারা সৎসর ধরে চাষাবাদ হয়ে থাকে। প্রায় ১৫টি প্রজাতির পোকা-মাকড় বেগুনে আক্রমণ করে, এর মধ্যে শোষক পোকা উভয় মৌসুমে বিশেষ করে গ্রীষ্মে মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে থাকে। শোষক পোকাগুলির মধ্যে সাদা মাছি, জ্যাসিড, জাব পোকা এবং থ্রিপস অন্যতম। বাংলাদেশ কৃষি গবেসণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত নিম্নোক্ত আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত পোকাসমূহ কার্যকরীভাবে কম করচে ও পরিবেশ সম্মত উপায়ে দমন করা সম্ভব।

হলুদ আঠালো ফাঁদে আকৃষ্ট জাব পোকা

সাদা আঠালো ফাঁদে আকৃষ্ট থ্রিপস পোকা

বায়োনিম প্লাস প্রয়োগকৃত প্লটে উৎপাদিত বেগুন

- **আঠালো ফাঁদের ব্যবহার:** জাব ও থ্রিপস পোকা বিভিন্ন ধরনের আঠালো ফাঁদে সহজে আকৃষ্ট হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগ ২(দুই)ধরনের আঠালো ফাঁদ উদ্ভাবন করেছে। জাব পোকার জন্য হলুদ আঠালো এবং থ্রিপস পোকার জন্য সাদা আঠালো ফাঁদ। চারা রোপণের ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে বেগুনের মাঠে ১৫-২০ মিটার দূরে দূরে একটি সাদা ফাঁদের পর

একটি হলুদ ফাঁদ স্থাপন করে জাব ও থ্রিপস পোকা আঠালো ফাঁদে ধরা পড়ে মারা যাবে।

❀ **বোটানিক্যাল কীটনাশক ব্যবহার:** আঠালো ফাঁদ ব্যবহারের পাশাপাশি ৭-১০ দিন পর পর এজাডিরাকটিন (বায়োনিম প্লাস ১ ইসি বা অন্য নামে) ১ মিলি লিটার হারে ৩-৪ বার স্প্রে করে এই পোকা গুলো দমন করা যায়।

কাকরোল, টমেটো ও শসা থেকে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ দূরীকরণ

সবজি মানুষের দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। দূর্ভাগ্যবশত সবজি ফসল প্রায়ই পোকামাকড় ও রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় যা সবজির উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রণে ব্যপক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি ও ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাসায়নিক কীটনাশক ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে যার অবশিষ্টাংশ ভোক্তার স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এই ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্য সবজি থেকে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ অপসারণ করা জরুরি। বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকরণ কৌশল বা পদ্ধতি ব্যবহার করে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ কিছুটা হলেও অপসারণ করা যায়।

কাকরোল, টমেটো ও শসা থেকে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ অপসারণ তথা দূরীকরণ রান্নাঘরে সহজলভ্য কিছু উপাদান যেমন খাবার লবণ ও ভিনেগার দ্বারা সহজেই করা যেতে পারে। তাছাড়া, খোসা ছাড়ানোর মাধ্যমে শসা হতে অর্গানোফসফরাস কীটনাশকের যথা- ডাইমেথয়েড, ক্লোরপাইরিফস, কুইনালফস, ডায়াজিনন, ম্যালাথিয়ন এবং ফেনিট্রোথিয়নের অবশিষ্টাংশ অপসারন করা যায় যা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

খাবার লবণ + খোসা ছাড়ানো

বাজার থেকে কিনে আনা শসা পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে → প্রতি লিটার পানিতে ২০ গ্রাম হারে লবন যোগ করে লবণপানি তৈরি করতে হবে → তৈরিকৃত লবণপানিতে শসা ১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে → চাকু দিয়ে শসার খোসা ছাড়াতে হবে →পরিষ্কার পানি দিয়ে খোসা ছাড়ানো শসা ধুয়ে ফেলতে হবে।

এই পদ্ধতিতে ৮৫% পর্যন্ত ক্লোরপাইরিফস, কুইনালফস, ডায়াজিনন, ম্যালাথিয়ন এবং ফেনিট্রোথিয়নের অবশিষ্টাংশ অপসারণ করা সম্ভব।

ভিনেগার দ্বারা

বাজার থেকে কিনে আনা কাকরোল ও টমেটো পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে → প্রতি লিটার পানিতে ২০ মিলি হারে এসিটিক এসিড বা ভিনেগার যোগ করে

ভিনেগার-পানি তৈরি করতে হবে ⟶ তৈরিকৃত ভিনেগার-পানিতে কাকরোল ও টমেটো ১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে ⟶ পরিষ্কার পানি দিয়ে কাকরোল ও টমেটো ধুয়ে নিতে হবে ⟶ পানিতে ১৫ মিনিট রান্না করতে হবে।

এই পদ্ধতিতে ৮০% পর্যন্ত ডাইমেথয়েড, ক্লোরপাইরিফস, কুইনালফস, ডায়াজিনন, ম্যালাথিয়ন এবং ফেনিট্রোথিয়নের অবশিষ্টাংশ অপসারণ করা সম্ভব।

সবজি থেকে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ দূরীকরণ পদ্ধতি

ফুলকপির বীজ উৎপাদনে মলিবডেনামের ব্যাবহার

অনুমোদিত মাত্রায় (প্রতি হেক্টরে গোবর সার-১০ টন, ইউরিয়া-৩০০ কেজি, টিএসপি-২০০ কেজি, এমওপি-২৫০ কেজি, জিপসাম-১০০ কেজি, জিংক সালফেট-১২ কেজি এবং বোরিক এসিড-১০ কেজি) এর সাথে ১.৫ কেজি মলিবডেনাম (৪ কেজি সোডিয়াম মলিবডেট) ব্যবহার করে সর্বোচ্চ পরিমাণ বীজ পাওয়া যায় এবং বীজের গুণগত মান ভাল হয়। ইউরিয়া ও এমওপি ছাড়া গোবর ও অন্যান্য সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও এমওপি সমান চার ভাগে ভাগ করে চারা লাগানোর

১৫, ৪০, ৬০ ও ৯০ দিন পর গাছের চতুর্দিকে রিং আকারে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। মলিবডেনাম জমি তৈরির শেষ চাষের সময় অথবা অর্ধেক শেষ চাষের সময় ও বাকি অর্ধেক পুষ্পমঞ্জুরী বের হওয়ার সময় স্প্রে করলে সর্বোচ্চ পরিমাণ বীজ (২৪০-২৫০ কেজি/হেক্টর) পাওয়া যায় তবে জমি তৈরির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করা তুলনামূলক লাভজনক।

সবজি থেকে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ দূরীকরণ পদ্ধতি

বেগুনের শিকড়ের গিঁট রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

জমি প্রস্তুতির শেষ চাষের সময় প্রতি হেক্টর জমিতে ২৫ কেজি ফুরাডান ৫ জি এবং চারা লাগানোর ২১ দিন পূর্বে প্রতি হেক্টরে ৫.০ টন মুরগির বিষ্টা (অপচনশীল অবস্থায়) প্রয়োগ করে ভালভাবে মাটি আলোড়িত করে দিতে হবে যার ফলে ব্যবহৃত মুরগির বিষ্টার পচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এর ফলে মাটিতে অবস্থিত বেগুনের শিকড়ের গিঁট সৃষ্টিকারী রোগজীবাণু ধ্বংস হয় এবং বেগুন গাছ এ রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

কন্ট্রোল প্লট

টমেটো উৎপাদনে ভার্মিকম্পোস্ট ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহার

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যঃ টমেটো উৎপাদনে ১০০% অনুমোদিত রাসায়নিক সারের (নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার, জিংক ও বোরন যথাক্রমে হেক্টরপ্রতি ১২০, ৪৫, ৬০, ২০, ২ ও ১ কেজি) পাশাপাশি ১.৫ টন ভার্মিকম্পোস্ট প্রয়োগ করলে টমেটোর সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায়। ভার্মিকম্পোস্ট ব্যবহার করলে ফলন ভাল হয় এবং মাটির স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

প্রযুক্তির উপযোগিতাঃ গাজীপুরের সোপান মাটিতে টমেটো চাষ করা যায়।

মাঠ পর্যায়ে তথ্যঃ শস্য- টমেটো;জাত-বারি টমেটো-১৪

সারের মাত্রা-

সারের নাম	সারের পরিমাণ (প্রতি হেক্টরে)
ইউরিয়া	২৬০ কেজি
টিএসপি	৯০ কেজি
এমওপি	১২০ কেজি
জিপসাম	৯০ কেজি
জিংক সালফেট (মনো হাইড্রেট)	৫.৫ কেজি
বোরিক এসিড	৬ কেজি
ভার্মিকম্পোস্ট	১.৫ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি- সমস্ত টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিংক সালফেট (মনো হাইড্রেট), বোরিক এসিড ও ভার্মিকম্পোস্ট এবং ১/৩ অংশ ইউরিয়া সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় মৌল মাত্রা হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে টমেটো গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধির পর্যায়ে (চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর) ও ফুল উৎপাদন পর্যায়ে (চারা রোপণের ৫৫-৬০ দিন পর) প্রয়োগ করতে হবে।

ফলনঃ ৬৫-৭০ টন/হেক্টর।

গাজীপুরে ১.৫ টন/হেক্টর ভার্মিকম্পোস্ট ও ১০০% অনুমোদিত মাত্রার রাসায়নিক সার সমন্বিত ভাবে ব্যবহার করে ১০০% অনুমোদিত মাত্রার রাসায়নিক সারের তুলনায় টমেটোর শতকরা ১৫-২৬ ভাগ ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

মটরশুঁটি উৎপাদনে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার, ভার্মিকম্পোস্ট ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহার

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: মটরশুঁটি চাষে ইউরিয়া সারের পরিবর্তে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার (বারি আরপিএস-৫০১) ও ভার্মিকম্পোস্টব্যবহার করলে ফলন ভাল হয় এবং মাটির অবস্থাও ভাল থাকে। মটরশুঁটি গাছের শিকড়ে রাইজোবিয়াম নামক ব্যাকটেরিয়া গুটি বা নডিউল তৈরি করে। উক্ত ব্যাকটেরিয়া বায়ুমন্ডল থেকে নাইট্রোজেন সঞ্চায়ন করে মটরশুঁটি গাছকে দেয় এবং বিনিময়ে মটরশুঁটি গাছ থেকে নিজের জন্য কার্বোহাইড্রেট নেয়।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: গাজীপুর ও রহমতপুরসহ বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় বেলে দোআঁশ মাটিতে মটরশুঁটি চাষ করা যায়।

মাঠ পর্যায়ে তথ্য: শস্য-মটরশুঁটি;জাত-বারি মটরশুঁটি-৩।

সারের মাত্রা-

সারের নাম (বারি আরপিএস-৫০১)	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
অণুজীব সার	১.৫ কেজি
টিএসপি	০
এমওপি	৫২
জিপসাম	৯৪
জিংক সালফেট	১৩
বোরিক এসিড	৪.৪৭
ভার্মিকম্পোস্ট (টন/হেক্টর)	৫

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: পরিমাণমতো গাম বা শুধুমাত্র পানি দিয়ে বীজের সাথে অণুজীব সার মিশাতে হবে। ঠাণ্ডা ও শুকনো জায়গায় রেখে অণুজীব সার মিশ্রিত বীজ বাতাসে শুকাতে হবে। অণুজীব সার ছাড়া অন্যান্য সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে।

ফলন: ৯.৮৮-১১.২ টন/হেক্টর

১.৫ কেজি/হেক্টর রাইজোবিয়াম ইনোকুলাম, ৫ টন/হেক্টর ভার্মিকম্পোস্টও ইউরিয়া বাদে অন্যান্য রাসায়নিক সার সমন্বিত ভাবে ব্যবহার করে অনুমোদিত মাত্রার রাসায়নিক সারের তুলনায় গাজীপুর ও রহমতপুরে মটরশুঁটির শতকরা ২০-৩২ ভাগ ফলন বৃদ্ধি সম্ভব।

ঝাড়শিম উৎপাদনে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার, ভার্মিকম্পোস্ট ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহার

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: ঝাড়শিম চাষে ইউরিয়া সারের পরিবর্তে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার (বারি আরপিভি-৭০২) ও ভার্মিকম্পোস্টব্যবহার করলে ফলন ভাল হয় এবং মাটির অবস্থাও ভাল থাকে। ঝাড়শিম গাছের শিকড়ে রাইজোবিয়াম নামক ব্যাকটেরিয়া গুটি বা নডিউল তৈরি করে। উক্ত ব্যাকটেরিয়া বায়ুমন্ডল থেকে নাইট্রোজেন সঞ্চায়ন করে ঝাড়শিম গাছকে দেয় এবং বিনিময়ে ঝাড়শিম গাছ থেকে নিজের জন্য কার্বোহাইড্রেট নেয়।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: গাজীপুর ও রহমতপুরসহ বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় বেলে দোআঁশ মাটিতে ঝাড়শিম চাষ করা যায়।

মাঠ পর্যায়ে তথ্য: শস্য-ঝাড়শিম; জাত- বারি ঝাড়শিম-১

সারের মাত্রা-

সারের নাম (বারি আরপিভি-৭০২)	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
অণুজীব সার	১.৫ কেজি
টিএসপি	৬০
এমওপি	১২৮
জিপসাম	৯৪
জিংক সালফেট	১৩
বোরিক এসিড	৪.৪৭
ভার্মিকম্পোস্ট(টন/হেক্টর)	৫

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: পরিমাণমতো গাম বা শুধুমাত্র পানি দিয়ে বীজের সাথে অণুজীব সার মিশাতে হবে। ঠাণ্ডা ও শুকনো জায়গায় রেখে অণুজীব সার মিশ্রিত বীজ বাতাসে শুকাতে হবে। অণুজীব সার ছাড়া অন্যান্য সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে।

ফলন: ১৫.৮-১৬.৩ টন/হেক্টর

১.৫ কেজি/হেক্টর রাইজোবিয়াম ইনোকুলাম, ৫ টন/হেক্টর ভার্মিকম্পোস্টও ইউরিয়া বাদে অন্যান্য রাসায়নিক সার সমন্বিত ভাবে ব্যবহার করে অনুমোদিত মাত্রার রাসায়নিক সারের তুলনায় গাজীপুর ও রহমতপুরে ঝাড়শিমের শতকরা ২১-৪৬ ভাগ ফলন বৃদ্ধি সম্ভব।

উঁচ বেড পদ্ধতি ও পটাশিয়াম ব্যবহারের মাধ্যমে লবণাক্ত মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও ভুট্টা উৎপাদন

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: পটুয়াখালির কুয়াকাটা ও নোয়াখালির হাজিরহাট যেখানে মাটির লবণাক্ততা খরা মৌসুমে (মার্চ এপ্রিল মাসে) ০৯-১৩ ডিএস/মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় সেসব এলাকায় উঁচু বেড পদ্ধতি ও প্রচলিত সুপারিশের চেয়ে শতকরা ৫০ বেশি মাত্রার পটাশিয়াম সার (এমওপি) প্রয়োগ করে বারি হাইব্রিড ভুট্টা- ৯ এর ৯.১৭ টন/হেক্টর ফলন পাওয়া গেছে যা প্রচলিত চাষাবাদ পদ্ধতির তুলনায় শতকরা ২৯ ভাগ বেশি। এমতাবস্থায় লবণাক্ত অঞ্চলে প্রচলিত সুপারিশের চেয়ে শতকার ৫০ ভাগ অধিক মাত্রায় পটাশিয়াম প্রয়োগ করে উঁচু বেড পদ্ধতিতে ভুট্টা চাষ করলে একদিকে যেমন মৃত্তিকা দ্রবণের পটাশিয়াম আধিক্যের কারণে গাছ কর্তৃক সোডিয়াম আহরণ বাধাগ্রস্থ হয় ও লবণাক্ততার বিরূপ প্রভাব গাছ মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় অন্যদিকে ফসলের ফলন বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে উঁচু বেড পদ্ধতি লবণ দ্রব্যের

লবণাক্ত অঞ্চল কোয়াকাট, পটুয়াখালীতে হাইব্রিড ভুট্টা উৎপাদন

উর্ধ্বমুখী চাপ কমিয়ে দিয়ে প্রাথমিক অবস্থায় গাছের মূলসহ অন্যান্য অঙ্গের বৃদ্ধি ওবিকাশের কার্যকর ভূমিকা রাখে।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: নোয়াখালী, পটুয়াখালীসহ উপকূলীয়লবণাক্ত অঞ্চল।

মাঠ পর্যায়ে তথ্য: শস্য-ভুট্টা; জাত- বারি হাইব্রিডভুট্টা-৯

সারের মাত্রা-

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*	
	নোয়াখালী	পটুয়াখালী
ইউরিয়া	৬৩৬	৫৯৫
টিএসটি	৩৪০	২৮৫
এমওপি	২৭০	১৬০
জিপসাম	১২৫	১৫৫
জিংক সালফেট (মনো হাইড্রেট)	১০	১০
বোরিক এসিড	০৬	০৬

* মৃত্তিকা নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে অঞ্চলভেদে উক্ত সারের মাত্রা কম/বেশি হতে পারে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: উপরোক্ত সুপারিশের সম্পূর্ণ পরিমাণ টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট (মনোহাইড্রেট), বোরিক এসিড এবং দুই তৃতীয়াংশ এমওপি সার জমি তৈরির শেষে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সার সমান তিন ভাগ করে প্রথম কিস্তি বীজ গজানোর ৫ দিন পর, দ্বিতীয় কিস্তি গাছের কাণ্ড বৃদ্ধি পর্যায়ে সাধারনত বীজ গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর এবং শেষ কিস্তি পুরুষফুল আসার পর্যায়ে (বীজ গজানোর ৫০-৫৫ দিন পর) প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ এমওপি সার দ্বিতীয় কিস্তি ইউরিয়া সারের সাথে বীজ গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর প্রয়োগ করা বিধেয়।

ফলন-: ৮-৯ টন/হেক্টর

উঁচু বেড পদ্ধতি ব্যবহার করে ও প্রচলিত সুপারিশের চেয়ে শতকরা ৫০ ভাগ বেশি মাত্রার পটাশিয়াম ব্যবহার করে লবণাক্ত এলাকায় হাইব্রিড ভট্টা ৩০-৪০% অতিরিক্ত ফলন পাওয়া যেতে পারে।

পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ এবং শুকনা মরিচের গুঁড়ার মাধ্যমে কাঠবিড়ালী দমন

পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ এবং শুকনা মরিচ গুঁড়া এর মিশ্রণ স্প্রের মাধ্যমে সবজি, ফল এবং মাঠের অন্যান্য ফসল থেকে কাঠবিড়ালী সফলভাবে ৪ থেকে ৫ দিন অবধি বিতারন সম্ভব। এটি একটি সহজ পদ্ধতি, কৃষকভাই ও বোনেরা খুব সহজে নিজ বাড়ীতে এই মিশ্রণটি তৈরি করে তাদের মাঠের কাঠবিড়ালী বিতাড়ন করতে পারবেন।

মিশ্রণ তৈরির পদ্ধতি: প্রথমে, ৫০ গ্রাম পেঁয়াজ, ১০ গ্রাম কাঁচামরিচ এবং ১০ গ্রাম শুকনা মরিচ গুঁড়া মেপে নিতে হবে। এর পর পেঁয়াজগুলো ছিলে নিতে হবে। তারপর পেঁয়াজ ও কাঁচামরিচ চাকু দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে নিতে হবে। এরপর একটি সসপেনে ২ লিটার পানির মধ্যে পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ এবং শুকনা মরিচ গুঁড়া নিয়ে মিশ্রণটি চুলায় ৩০ মিনিট ফুটাতে হবে। মিশ্রণটি ঠাণ্ডা হলে, তা একটি পাত্রে ছেঁকে নিতে হবে। এরপর ছেঁকে নেওয়া মিশ্রণটি স্প্রে মেশিনে ঢেলে নিতে হবে। ফল গাছের সংখ্যা ও জমির পরিমাণ অনুযায়ী সঠিক পরিমাণ মিশ্রণ তৈরি করে নিতে হবে।

স্প্রে পদ্ধতি: ফল গাছে ফুটপাম্প স্প্রে মেশিন এবং ফসলের মাঠের জন্য ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ব্যবহার করে গাছের ক্যানোপি ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। এভাবে ৪ থেকে ৫ দিন পর পর স্প্রে করতেহবে।

শুকনা মরিচের গুঁড়া

পেঁয়াজ

ফুটানো মিশ্রণ স্প্রে করা

কাঁচা মরিচ

ফুটানো মিশ্রণ

সমন্বিত আগাছা দমনের মাধ্যমে মুগডালের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন

মুগডাল ফসল উৎপাদনে আগাছার উপদ্রব একটি মারাত্মক সমস্যা। বিশেষত খরিফ-১ মৌসুমে আগাছা দমন দুরূহ হয়ে পড়ে।মুগডালের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে বীজ বপন পূর্বক আগাছা নাশক প্রয়োগ এবং এর সাথে বীজ বপন পরবর্তী আগাছা দমন খুবই কার্যকরী। জমিচাষের এক সপ্তাহ পূর্বে আগাছা নাশকগ্লাইফোসেট প্রতিলিটার পানিতে ৭.৫ মিলিলিটার হারে ৫ শতক জমির জন্য ১০ লিটার মিশ্রণ প্রয়োগ করে পরবর্তীতে চারা গজানোর ২০ দিন পর একবার নিড়ানী দ্বারা আগাছা পরিষ্কার করলে ১.৫৭ টন/হেক্টও মানসম্পন্ন (শতকরা ৮০ ভাগের অধিক গজানো ক্ষমতা সম্পন্ন) মুগডালের বীজ পাওয়া যায়। আগাছা নাশক গ্লাইফোসেট সব ধরনের আগাছা দমনের জন্য কার্যকরী।

সমন্বিত আগাছা দমনের পরীক্ষণ প্লটের ছবি

সমন্বিত আগাছা দমনের প্লটের বীজের অঙ্কুরোদ্গম

আগাছা দমন বিহীন প্লটের বীজের অঙ্কুরোদ্গম

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

উপযোগিতাঃ সমন্বিত আগাছা দমন প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষক একদিকে মুগডালের অধিক বীজ পাবে, অন্যদিকে বীজের উৎপাদন খরচ কম পড়বে। প্রচলিত হাত দ্বারা আগাছা দমন পদ্ধতিতে অনেক কৃষি শ্রমিকের প্রয়োজন পড়ে, তাছাড়া সময়মত কৃষি শ্রমিক পাওয়া ও যায় না। সমন্বিত আগাছা দমন প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষক স্বল্প খরচে ও সঠিক সময়ে আগাছা দমন করতে পারে বিধায় মানসম্পন্ন মুগডালের অধিক বীজ উৎপাদন করতে পারে। এজন্য কৃষকেরা অধিক আয় করতে পারে। এই প্রযুক্তিতে গ্রসমার্জিন (Gross Margin) ১,৩৪,৮৫০ টাকা/হেক্টর এবং মারজিনাল বেনেফিট কস্ট রেশিও (Marginal Benefit Cost Ratio) ৫.৩২।এই প্রযুক্তি বাংলাদেশের মুগডাল উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ যেমন-যশোর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, নাটোর, পাবনা, রাজশাহী ও বরিশাল জেলার জন্য উপযোগী হবে।

উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে স্বাদু ও লবণাক্ত পানির সংযোজক সেচ প্রয়োগে ফসল উৎপাদন

- বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে স্বাদু পানির উৎস খুবই সীমিত (সাধারণত পুকুরের পানি বা কিছু কিছু এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানি অপেক্ষাকৃত কম লবণাক্ত), অথচ এসব এলাকায় পর্যাপ্ত পানির আধার রয়েছে যার বেশিরভাগই মাঝারী থেকে অধিক মাত্রায় লবণাক্ত (যেমন- খাল, নদী বা আশেপাশের নিম্নভূমির পানি) ।

- প্রতিটা ফসলই তাদের অঙ্কুরোদ্‌গমের সময় ও বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে লবণাক্ততা সহ্য করতে পারেনা। যদি শুধুমাত্র লবণাক্ত পানি দিয়ে সবগুলো সেচ দেয়া হয় তাহলে ফসলের ফলন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। এমতাবস্থায়, ফসলের প্রাথমিক সংবেদনশীল পর্যায়ে পরিমিত মাত্রার অপেক্ষাকৃত স্বাদু পানির একটি সেচের ব্যবস্থা করে পরবর্তী পর্যায়গুলোতে প্রয়োজন অনুযায়ী ২/৩ টি লোনা পানির সেচ দেয়া হলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়।

স্বাদু ও লবণাক্ত পানির সংযোজক সেচে ভুট্টা (স্থান: বেনারপোতা, সাতক্ষীরা) সূর্যমুখী ও গম চাষ।

- ফসল উৎপাদনে স্বাদু ও লবণাক্ত পানির এরূপ ব্যবহারকে বলা হয় সংযোজক ব্যবহার।

- সেচ কাজে স্বাদু ও লবণাক্ত পানির সংযোজক ব্যবহার যেমন উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃত পতিতভূমিতে ফসল উৎপাদনে সহায়ক ভুমিকা পালন করতে পারে, তেমনি সীমিত স্বাদু পানির উৎসগুলোকে (বিশেষত ভূ-গর্ভস্থ স্বাদু পানি) সংরক্ষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে।

❀ এই প্রযুক্তির সম্প্রসারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পাবে, ফলশ্রুতিতে অত্র অঞ্চলের কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

উপযোগী ফসলঃ ভুট্টা, গম, সরিষা, সূর্যমুখী ইত্যাদি ফসলের মাঝারী মাত্রার লবণাক্ত সহিষ্ণু আধুনিক জাত উক্ত প্রযুক্তির জন্য উপযুক্ত।

ব্যবহার উপযোগী এলাকাঃ বাংলাদেশের উপকূলীয় লবণাক্ত কবলিত ১৯টি জেলা।

মসুরের স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট (পাতা ঝলসানো) রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

বর্তমানে মসুর চাষে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হল স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট (পাতা ঝলসানো) রোগ যার ফলে শতকরা ৮০ ভাগ ফলন কমে যেতে পারে। এ রোগের অনুকুল আবহাওয়ায় যেমন রাতের তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রির নিচে ও দিনের তাপমাত্রা ২১ ডিগ্রির উপরে এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ও কুয়াশাচ্ছন্ন বা মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া থাকলে এ রোগের আক্রমণ হতে পারে। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় পাতার উপর হালকা বাদামী রঙের ছোট ছোট দাগ দেখা যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে সমগ্র ফসলের মাঠটিই ঝলসে যায়। তাই রোগ সংক্রমণের সাথে সাথেই গাছে ফল ধরা শুরু করলেই প্রতিশেধক হিসেবে এই প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে গবেষণা পর্যায়ে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ নাটিভো এবং ফলিকুর নামক ছত্রাকনাশক মসুরের স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগের দমনে কার্যকরী ভাবে কাজ করে। এ রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে শুধুমাত্র ফলিকুর ২ এমএল/লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করলে এ রোগের অনিষ্ট থেকে ফসল রক্ষা করা যায় এবং অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হওয়া যায়।

ফলিকুর প্রয়োগ প্লট

কন্ট্রোলপ্লট

সংরক্ষণ কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে ধানী জমিতে মসুর চাষ

প্রযুক্তির বিস্তারিত বিবরণঃ অনিশ্চিত জলবায়ুগত অবস্থা, শ্রমিক এবং জ্বালানী ঘাটতির এই বর্তমান সময়ে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য উৎপাদনে প্রচলিত কৃষক পদ্ধতিতে (নিবিড় চাষাবাদ এবং পূর্ববর্তী ফসলের অবশিষ্টাংশ উচ্ছেদকরণ) চাষাবাদের কারণে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোতে জৈব পদার্থের ক্রমাগত হ্রাস, মাটির ভৌতিক গুণাবলীর অবনতি ও ফসলের ফলন ঘাটতিসহ কৃষকের খামারের মুনাফা হ্রাস হচ্ছে। ফলে বর্তমান কৃষি ব্যবস্থাপনা অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে। এই অসুবিধা নিরসনের লক্ষ্যে সংরক্ষণকৃষির পদ্ধতিতে ধানী জমিতে মসুর চাষ করা হচ্ছে এবং সফলতার সাথে বিস্তার লাভ করছে। এই পদ্ধতি (স্ট্রিপ টিলেজ এবং পূর্ববর্তী ফসলের অবশিষ্টাংশ) যা তিনটি আন্তঃসংযুক্ত মূলনীতি যেমন- স্বল্প চাষ, পূর্ববর্তী ফসলের অবশিষ্টাংশ ধরে রাখা এবং উপযোগী শস্য বিন্যাসের মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বাড়ানো, ফসলের ফলন ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা যায় । দেশের উত্তরাঞ্চলের যেসকল মাটির pH ৭-৮ এর মধ্যে, সেসকল ধানী জমিতে সংরক্ষণকৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে বোনা আমন ধানের পরে মসুর উৎপাদন করা যায়। বোনা আমন ধান কাটার সময় ধানের খড়ের ৫০ % অবশিষ্টাংশ জমিতে রেখে টু-হুইল ট্রাক্টর (2-wheel tractor) নামক একটি মেশিন ব্যবহার করে স্ট্রিপ টিলেজে একই সাথে জমি চাষ, বীজ বপন ও সার প্রয়োগ করা হয় (ছবি-১)। এ পদ্ধতিতে মসুর বপনের উপযুক্ত সময় নভেম্বর মাসের প্রথম দুই সপ্তাহ। এই পদ্ধতিতে ধানের খড়ের মধ্যে মসুর সারিতে বপন করা হয়, ফলে প্রতিটি গাছ সমানভাবে আলো, বাতাস ও পুষ্টি পায় এবং খড়ের দ্বারা সংরক্ষিত মাটির রস পায় যা প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় গাছের বর্ধন ও ফলন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে (ছবি-২)। এই পদ্ধতিতে মসুর চাষ করলে প্রতিটি স্ট্রিপ ৪-৫ সে. মি. প্রসস্থ এবং ৫-৭ সে. মি. গভীরতার হয়ে থাকে। মসুরের সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০-৩০ সে. মি. রাখা হয়। উল্লেখ্য যে, পদ্ধতিটিতে শুধুমাত্র সারির মধ্যে চাষ হয় এবং দুই সারির মধ্যে অচাষ অবস্থায় থাকে, ফলে পুরো জমির মাত্র ২০ ভাগ জায়গা একবার চাষ হয় এবং বাকি ৮০ ভাগ জায়গা অচাষ অবস্থায় থাকে। সংরক্ষণকৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে ধানী জমিতে মসুর চাষ করে কৃষক প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় ১৬-১৮ % ফলন বেশি পায়। অধিকন্তু, এই পদ্ধতিতে চাষবাদ প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় তিনগুন জ্বালানী খরচ ও সময় কমায়। এছাড়া প্রচলিত কৃষক পদ্ধতির তুলনায় সংরক্ষণকৃষি পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে মসুরের আগাছার পরিমাণ, জাবপোকা এবং পাতা ঝলসানো রোগের প্রাদুর্ভাব কম হয়। সুতরাং, কৃষক সংরক্ষণকৃষি (স্বল্প চাষ, পূর্ববর্তী ফসলের অবশিষ্টাংশ ধরে রাখা এবং লিগিউম ভিত্তিক শস্য বিন্যাস) পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে স্বল্প খরচে, সময়ে ও স্বল্প শ্রমিকে মসুরের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

টু-হুইল ট্রাক্টর (2-wheel tractor) দ্বারা স্ট্রিপ টিলেজে ৫০ % ধানের খড়ের মধ্যে মসুরের বীজ বপন ও সার প্রয়োগ।

স্ট্রিপ টিলেজে ও ৫০ % ধানের খড়ের মধ্যে মসুরের বর্তমান অবস্থা।

সেডনেটে জারবেরা পাতায় GA_3 প্রয়োগের মাধ্যমে ফুলের গুণগত মান ও সংখ্যা বৃদ্ধি

ভূমিকাঃ জারবেরা অ্যাসটারেসী পরিবারভূক্ত উচ্চমূল্যের একটি আকর্ষণীয় ফুল। সমগ্র বিশ্বের ফুল বানিজ্যে যে চারটি ফুল সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় জারবেরা তাদের মধ্যে অন্যতম। চাহিদার দিক দিয়ে এবং বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে এ ফুলের জুড়ি নেই। সারাবছরই বাজারে এর চাহিদা থাকে এবং বিভিন্নভাবে এ ফুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে কাটফ্লাওয়ার হিসেবে ফুলদানীর জন্য এটি অনন্য। এ ছাড়া মালা, পুষ্পস্তবক, বেনী, খোপায় এবং মুকুট তৈরিতে এ ফুল ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের আবহাওয়া এ ফুল চাষের জন্য উপযোগী। উচ্চমূল্যের ফুল ফসলের কারণে জারবেরার চাষ এখন লাভজনক ফসল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশে সাধারণত শীতের সময় জারবেরা ফুলের চাষ করা হয়। গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত বৃষ্টি ও তাপমাত্রা জারবেরা চাষের জন্য ক্ষতিকর। এজন্য পলিসেডে জারবেরা চাষের মাধ্যমে সারাবছরব্যাপী রোগ-পোকামাকড় মুক্ত ও গুণগতমানের ফুল উৎপাদন করা সম্ভব। বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক হরমোনের (গ্রোথ হরমোন) ব্যবহার দিনদিন বাড়ছে। এটি উদ্ভিদের শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব ফেলে। এছাড়া ফুল গাছের ফলন ও ফুলের গুণগত মান বৃদ্ধি করে। অন্যান্য গ্রোথ

হরমোনের মধ্যে GA_3 ফুলের গুনগত মান বৃদ্ধি ও দ্রুতসময়ে ফুল উৎপাদনের জন্য বেশি কার্যকর।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যঃ গবেষণায় দেখা গেছে সেডনেটে ১০০ পিপিএম ঘনত্বের GA_3 জারবেরা পাতায় ২ বার প্রয়োগের মাধ্যমে ফুলের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন আগাম ফুল ফোটা, গাছের দৈর্ঘ্য, গাছপ্রতি ফুলের সংখ্যা, বাজারযোগ্য ফুলের স্টিকের সংখ্যা, ফুলের সজীবতা বৃদ্ধি ইত্যাদি অর্জিত হয়েছে। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে চারা লাগাতে হবে। চারা গুলোকে ৫০ সে.মি. × ৪০ সে.মি. দূরত্বে রোপণ করতে হবে। হেক্টরপ্রতি জমিতে ৫ টন গোবর, ৫০০ কেজি কোকোডাষ্ট, ১৫০কেজি নাইট্রোজেন, ১৫০ কেজি এমওপি, ৭৫ কেজি ফসফরাস, ১২ কেজি বোরন, ৩০ কেজি সালফার ও ৪ কেজি জিংক প্রয়োগ করতে হবে। টিএসপি, এমওপি, কোকোডাষ্ট, ফসফরাস, বোরন, সালফার, জিংক বেসাল ডোজ হিসেবে দিতে হবে। ইউরিয়া সার চারা লাগানোর ৩০ ও ৬০ দিন পরবর্তীতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে। গ্রোথ হরমোন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এমনদিন বাছাই করতে হবে যেদিন বা যার পরদিন বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কম থাকে। এক্ষেত্রে লাগানো চারার বয়স যথাক্রমে ২৫, ৫০ দিন হলে ১০০পিপিএম GA_3 এর জলীয় দ্রবণ পাতায় স্প্রে করতে হবে।

বাঁধাকপি ও ফুলকপি ফসলের সাধারণ কাটুই পোকার সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

বাঁধাকপি ও ফুলকপির একটি প্রধান অনিষ্টকারী পোকা। ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে পাতায় একত্রে গাদা করে থাকে এবং পাতার বিভিন্ন অংশ গোলাকার করে খেয়ে বড় হতে থাকে। এভাবে খাওয়ার ফলে পাতা জালের মত হয়ে যায় এবং তা দূর থেকে দেখেই চেনা যায়। কাছে গেলে ঐ জালের মত হয়ে যাওয়া পাতায় অনেক কীড়া দেখতে পাওয়া যায়। কয়েক দিনের মধ্যে এরা ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ে এবং বড় বড় ছিদ্র করে পাতা খেয়ে ফেলে।

সাধারণ কাটুই পোকা

পোকা আক্রান্ত বাঁধাকপি

বাঁধাকপির জমিতে স্থাপিত ফেরোমন ফাঁদ

দমন ব্যবস্থাপনা

- যেহেতু পোকার দল প্রথম দিকে দলবদ্ধ অবস্থায় থাকে সেজন্য প্রতিটি গাছ যত্ন নিয়ে দেখলেই পাতায় কীড়া খাওয়া চিহ্ন সহজেই চোখে পড়ে। ঐ অবস্থায়

আক্রান্ত পাতা কীড়াসহ গাছ থেকে ছিড়ে নিয়ে পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলতে হবে এবং ছড়িয়ে পড়া বড় কীড়াগুলোকে ধরে ধরে মেরে ফেলতে হবে। এ ভাবে অতি সহজেই এ পোকা দমন করা যায়।

- প্রতি সপ্তাহে একবার করে কীড়া নষ্টকারী পরজীবি পোকা, *ব্রাকন হেবিটর* (হেক্টরপ্রতি এক বাংকার বা ৮০০-১২০০টি হিসাবে) পর্যায়ক্রমিকভাবে মুক্তায়িত করলে এ পোকার আক্রমণের হার অনেকাংশে কমে যায়।
- চারা লাগানোর এক সপ্তাহের মধ্যেই জমিতে ফেরোমন ফাঁদ পাততে হবে। ফেরোমন ফাঁদ পাতার পরও যদি আক্রমণের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় তবে জৈব বালাইনাশক এসএনপিভি প্রতি লিটার পানিতে ০.২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

মরিচের ফলছিদ্রকারী পোকা এর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

মরিচের ফলছিদ্রকারী একটি বহুভোজী পোকা (Polyphagous pest) পোকা। কীড়া সাধারনত ফলের বৃন্তের কাছে ছোট ছিদ্র করে ফলের মধ্যে ঢুকে পড়ে ভিতরের অংশ খায়। একই কীড়া একাধিক ফলে আক্রমণ করতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত ফলের ভিতরে পোকার বিষ্ঠা ও পচন দেখা যায়। আক্রান্ত ফল নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই পেকে যায়। আক্রান্ত ফলে ছিদ্র দেখে সহজেই এই পোকার উপস্থিতি বোঝা যায়।

ফলছিদ্রকারি পোকা আক্রান্ত মরিচ

মরিচের জমিতে স্থাপিত সেক্স ফেরোমন ফাঁদ

দমন ব্যবস্থাপনা

কীটতত্ত্ব বিভাগ, বারি কর্তৃক সাম্প্রতিক কালে উদ্ভাবিত নিম্নোক্ত আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উপরোক্ত পোকাসমূহ সহজে পরিবেশসম্মতভাবে দমন করা সম্ভব।

ক) ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার: মরিচের জমিতে চারা রোপণের দুই সপ্তাহ পরে ৩০ মিটার দূরে দূরে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করতে হবে।

খ) উপকারী পোকা অবমুক্তকরণ: প্রতি সপ্তাহে একবার করে কীড়া নষ্টকারী পরজীবি পোকা, *ব্রাকন হেবিটর* (হেক্টরপ্রতি এক বাংকার বা ৮০০-১২০০টি পূর্ণাঙ্গ পোকা) মরিচের জমিতে মুক্তায়িত করতে হবে।

গ) আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে জৈব বালাইনাশক এসএনপিভি প্রতি লিটার পানিতে ০.২গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

কচু ফসলের সাধারণ কাটুই পোকা (প্রোডেনিয়া ক্যাটাপিলার) এর সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

কচুর সাধারণ কাটুই পোকা (প্রোডেনিয়া ক্যাটাপিলার) একটি মারাত্মক ক্ষতিকারক পোকা। বিগত কয়েক বছর থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে কচু ফসলে এ পোকার ব্যাপক আক্রমণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই পোকার কীড়া সাধারনত গাছের পাতা অথবা সবুজ অংশ খায়। পূর্ণবয়স্ক কীড়া খুব দ্রুত সম্পূর্ণ পাতা খেয়ে ফেলে। গাছের সমস্ত পাতায় বড় বড় ছিদ্র হয় এবং পাতা নস্ট হয়ে যায়। অনেক সময় গাছ মরে যায়।

সাধারণ কাটুই পোকা আক্রান্ত কচুর পাতা

কচুর জমিতে স্থাপিত সেক্স ফেরোমন ফাঁদ

দমন ব্যবস্থাপনা

কীটতত্ত্ব বিভাগ, বারি কর্তৃক সাম্প্রতিক কালে উদ্ভাবিত নিম্নোক্ত আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উপরোক্ত পোকাসমূহ সহজে পরিবেশসম্মতভাবে দমন করা সম্ভব।

ক) ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার: কচুর জমিতে চারা রোপণের দুই সপ্তাহ পরে ৩০ মিটার দূরে দূরে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করতে হবে।

খ) উপকারী পোকা অবমুক্তকরণ: প্রতি সপ্তাহে একবার করে কীড়া নষ্টকারী পরজীবী পোকা, *ব্রাকন হেবিটর* (হেক্টরপ্রতি এক বাংকার বা ৮০০-১২০০টি পূর্ণাঙ্গ পোকা) কচুর জমিতে মুক্তায়ন করতে হবে।

গ) আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে জৈব বালাইনাশক এসএনপিভি প্রতি লিটার পানিতে ০.২গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

আকর্ষণ ও মেরে ফেলা পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন ফল যেমন আম, পেয়ারা, কমলা ও কুলের মাছি পোকা দমন

আম, পেয়ারা, কমলা, কুল ইত্যাদি ফলে মাছি পোকার আক্রমণে ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে। মুলত মাছি পোকার কীড়া ফলের ভিতরে ঢুকে ক্ষতি করে থাকে বিধায় কীটনাশক ব্যবহার করে এই পোকা দমন করা খুবই কঠিন। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগ অতি সম্প্রতি আকর্ষণ ও মেরে ফেলার মাধ্যমে মাছি পোকা দমনের একটি সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এ প্রযুক্তির প্রধান বৈশিষ্ঠ্য হলো একই সাথে পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী ও পুরুষ মাছি পোকা আর্কষণ করে মেরে ফেলা এবং প্রযুক্তিটি কার্যকর, সহজ ও পরিবেশ বান্ধব। ইতোপূর্বে ফেরোমন ফাঁদ ভিত্তিক দমন ব্যবস্থাপনায় শুধুমাত্র পুরুষ মাছি পোকা ফাঁদে আকৃষ্ট হয়ে মারা যেতো। কিন্তু নতুন এই পদ্ধতির মাধ্যমে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় পোকা আকৃষ্ট হয়ে মারা যায়। পুরুষ মাছি পোকা আকর্ষণ করার জন্য মিথাইল ইউজিনল ফেরোমন ও জৈব বালাইনাশক মিশ্রিত জেল বা পেস্টের মত একটি পদার্থ বাগানের সীমানা লাইনে অবস্থিত গাছের কাণ্ডে (মাটি হতে ৩-৪ ফুট উপরে) ১০-১২ মিটার দূরে দূরে অল্প পরিমাণে লাগিয়ে দিতে হবে। এই ভাবে সারা বাগানের সীমানা লাইনের গাছগুলিতে লাগিয়ে দেওয়ার ফলে অন্য বাগানেরসহ ঐ বাগানেরও পুরুষ মাছি পোকাসমূহ সীমানা লাইনের গাছে পেস্টের মধ্যে আকৃষ্ট হয়ে মারা যাবে। স্ত্রী মাছি পোকাকে আকৃষ্ট করে মেরে ফেলার জন্য বাগানের ভিতরের গাছগুলিতে ১০-১২ মিটার দূরে দূরে জৈব বালাইনাশক মিশ্রিত এক প্রকার পোকার খাবার সহ একটি ফাঁদ গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিতে হবে। গাছ অনেক বড় হলে একই গাছে পরিমাণ মত উক্ত খাবারের ফাঁদ স্থাপন করা যেতে পারে। এভাবে বাগানের ভিতরে থাকা সকল স্ত্রী পোকা খাবারের লোভে আকৃষ্ট হয়ে পাত্রের কাছে ছুটে যাবে এবং মারা যাবে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প খরচে এবং পরিবেশ সম্মত উপায়ে আম, পেয়ারা, কমলা, কুল ইত্যাদি ফসলের মাছি পোকা কার্যকরীভাবে দমনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

আকৃষ্ট পুরুষ মাছি পোকা

স্ত্রী মাছি পোকার ফাঁদ

আম গাছে পুরুষ পোকা আকৃষ্টকরণ জেল

স্ত্রী মাছি পোকার ফাঁদ

কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা এর সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা (*Nodostoma viridipennis* Mots.) সারা বাংলাদেশব্যাপী কলা চাষে যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। পূর্বে অমৃতসাগর কলাতেই এর আক্রমণের হার সর্বাধিক হত। তবে বর্তমানে প্রায় সব জাতের কলাতেই এ পোকার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। বিশেষত বর্ষা মৌসুমে কোন ধরনের দমন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত কলা এ পোকার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। তবে শুষ্ক মৌসুম বা শীতকালে আক্রামণের হার বেশ কম হতে দেখা যায়। কারণ উক্ত সময় বেশির ভাগ পোকা কীড়া অবস্থায় মাটির নিচে শীতনিদ্রা যায়। কলার মুড়ি ফসলে আক্রমণের হার সর্বাধিক হয়ে থাকে।

কীটতত্ত্ব বিভাগ, বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত নিম্নোক্ত আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উপরোক্ত পোকা সহজে পরিবেশসম্মতভাবে দমন করা সম্ভব:

ক) পর্যায়ক্রমিক ফসলের চাষ: যে সমস্ত বাগানে পোকার আক্রমণ হার অত্যন্ত বেশি সেখানে পরবর্তী বছর জমি উক্তমরুপে চাষ করে অন্য ফসল আবাদ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তৃতীয় বছর উক্ত জমিতে পুণরায় কলা চাষ করা যেতে পারে।

খ) পলিথিন ব্যাগিং: কলার মোচা বের হওয়ার সাথে সাথে ও ছড়িতে কলা বের হওয়ার পূর্বেই ১০৫ সে.মি. লম্বা ও ৭৫ সে.মি. প্রস্থের দু'মুখ খোলা একটি পলিথিন ব্যাগের একমুখ মোচার ভিতর ঢুকিয়ে বেঁধে দিতে হবে, অন্য মুখ খোলা রাখতে হবে। বাতাস চলাচলের জন্য পলিথিন ব্যাগটিতে ২০-৩০টি ছোট ছোট ছিদ্র রাখা বাঞ্ছনীয়। পলিথিন ব্যাগিং দ্বারা এ পোকা দমন অত্যন্ত কার্যকরী ও নিরাপদ বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

বিটল আক্রান্ত কলা

পূর্ণাঙ্গ বিটল পোকা

কলার কাঁদির পলিথিন ব্যাগিং

পোকামুক্ত কলার কাঁদি

গ) কীটনাশক দ্বারা পোকা দমন: মোচা বের হওয়ার ৫দিন আগে একবার, মোচা বের হওয়ার সাথে সাথে একবার, ছড়িতে প্রথম কলা বের হওয়ার পর একবার এবং সম্পূর্ণ কলা বের হওয়ার পর আরো একবার, মোট চারবার অনুমোদিত কীটনাশক স্প্রে করলে এই পোকা দমন সম্ভব। কীটনাশক, ডায়াজিনন ৬০ইসি (প্রতি লিটার পানিতে ২ মি.লি.) বা সেভিন ৮৫ ডাব্লিওপি (প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ গ্রাম) বা মিপসিন ৭৫ ডাব্লিও পি (প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম) স্প্রে করে ভাল ফল পাওয়া যায়।

হালকা বুনটের মাটির জন্য অধিক লাভজনক ফসল-ধারা: আগাম আলু-গম-ভুট্টা-আমনধান

ভূমিকা: বাংলাদেশে একদিকে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে বাড়ছে জনসংখ্যা। তাই বাড়তি জনগোষ্ঠীর খাদ্য যোগান দেয়ার জন্য অল্প জমিতে বেশি ফসল ফলানোর বিকল্প নেই। জমির উর্বরতা ঠিক রেখে একই জমিতে বছরে ৩টির জায়গায় ৪টি ফসল ফলাতে পারলে শস্যেও নিবিড়তা বৃদ্ধিও পাশাপাশি কৃষকের আয় ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে রংপুর বিভাগের বেশির ভাগ জমি উঁচুএবং মাটি বেলে-দোআঁশ প্রকৃতির। এ মাটির পানি-নিষ্কাশন খুবভালো হওয়ায় এবং শীতকালের আগেইতাপমাত্রা কমে যাওয়ায় আগাম আলু উৎপাদন করা সম্ভব। আগাম আলুর ভালো দাম পাওয়া যায় বলে এ অঞ্চলের বেশ কিছু সংখ্যক কৃষক অক্টোবর মাসের মধ্যে আলু বীজ রোপণ করে। আগাম আলু রোপণ করতে হবে বলে অনেক সময় আমন মৌসুমে জমি পতিত থাকে। অথচ স্বল্প-মেয়াদী জাতের আমন ধানের চাষ করেও আগাম আলু উৎপাদন করা সম্ভব। খরিফ-২ মৌসুমে যেমন বেশিরভাগ কৃষক আমন ধান আবাদ করে তেমনি আগাম আলু আবাদ করার পর ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলার কিছু সংখ্যক কৃষক গমের আবাদ করে। গমের পরে খরিফ-১ মৌসুমে লাভজনকভাবে হাইব্রিড ভুট্টার আবাদ করা সম্ভব। আগাম আলু, তাপ সহিষ্ণু জাতের গম, হাইব্রিড ভুট্টা এবং স্বল্প-মেয়াদী জাতের আমন ধান- এই ৪টি ফসল গম গবেষণা কেন্দ্র, নশিপুর, দিনাজপুরে একই জমিতে পর পর ৪ বছর সফলভাবে আবাদ করা হয় এবং আগাম আলু-গম-ভুট্টা-আমন ধান ফসল-ধারাটি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদের জন্য সুপারিশ করা হয়।

গোল আলু (গ্রানোলা) | *গম (বারি গম ২৫)* | *ভুট্টা (প্যাসিফিক ৯৮৪)* | *আমনধান (বিনাধান ৭)*

প্রযুক্তির বিবরণ: আগাম আলু লাগানোর জন্য আমন মৌসুমে (খরিফ-২) স্বল্প-মেয়াদী জাত যেমন বিনা ধান-৭ বা ১৫ অথবা ব্রি ধান ৫৬, ৫৭ বা ৬২ অথবা ব্রি হাইব্রিড ধান ৪ লাগাতে হবে। আমন ধান কাটার পর ১৫-২০ অক্টোবরেও তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় এমন আলুর জাত যেমন গ্রানোলাবাসাগিতা লাগাতে হবে এবং ৬০ দিন পর আলু উত্তোলন করতে হবে। আলু উত্তোলনের পর পরই গম বপন করতে হবে।

প্রযুক্তি হতেফলনঃ এই ফসল-ধারায় বছওে গড়ে ২২,১৬১ কেজি গমের সমতুল্য ফলন পাওয়া যায় এবং গড়ে ২,২০,০০০ টাকা খরচ করে ১,৭৫,০০০ টাকা লাভ করা সম্ভব।

প্রয়োগের স্থানঃ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হালকা বুনটের মাটিতে এই ফসল-ধারা খুবই উপযোগী। যেখানে ঘনঘন সেচ দিয়ে বোরো চাষ খুব একটা লাভজনক নয়, সেখানে এই ফসল-ধারা খুব লাভজনক।

টমেটো ও বেগুনের ড্যাম্পিং অফ বা চারা গাছ ঢলে পড়া রোগ দমনে কৃষকদের করণীয়

টমেটো শীতকালীন সবজী ও বেগুন সারা বছর চাষাবাদের উপযোগী সবজী হিসেবে বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয়। গ্রামাঞ্চলে এমন কোন বাড়ী পাওয়া যাবে না যেখানে আঙিনায় এ দুটি সবজীর গাছ দেখা যাবে না। কিন্তু এ দুটি সবজীর চারা তৈরিতে কৃষক ভা দের ড্যাম্পিং অফ বা চারা গাছ ঢলে পড়াজনিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। নিচে এই রোগের কারণ, লক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো।

টমেটো ও বেগুনের ড্যাম্পিং অফ বা চারা গাছ ঢলে পড়া রোগের কারণ

ফাইটোপথোরা, পিথিয়াম, ফিউজারিয়াম, রাইজোকটোনিয়া, স্কেলেরোশিয়াম ইত্যাদি প্রজাতির মাটি বাহিত ছত্রাকের কারণে বীজতলাতে এই রোগ হয়।

টমেটো ও বেগুনের ড্যাম্পিং অফ বা চারা গাছ ঢলে পড়া রোগের লক্ষণঃ

- আক্রান্ত অঙ্কুরিত চারার রং ফ্যাকাসে সবুজ হয়
- কাণ্ডের নিচের দিকে মাটি বরাবর বাদামী রঙের পানি ভেজা দাগ পড়ে।
- আক্রান্ত জায়গায় চারার গোড়া পচে যায় ও চারা মারা যায়।

টমেটো ও বেগুনের ড্যাম্পিং অফ বা চারা গাছ ঢলে পড়া রোগের লক্ষণ

টমেটো ও বেগুনের ড্যাম্পিং অফ বা চারা গাছ ঢলে পড়া রোগের ব্যবস্থাপনাঃ

বীজতলা তৈরিকরণ এবং সুস্থ ও সবল চারা উৎপাদন

- জমি উত্তমরুপে চাষ করতে হবে এবং চাষ দিয়ে ৫ দিন প্রখর রোদে জমি ফেলে রাখতে হবে।
- অতঃপর বীজতলার মাটি সমান করে কাঠের গুকনো গুঁড়ো ৩ ইঞ্চি বা ৬ সেমি পুরুস্তরে তৈরি করে বীজতলার উপরে সমানভাবে বিছিয়ে দিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে বীজতলার মাটি শোধন করতেহবে।
- বীজতলাতে বীজ বোনার আগে বীজকে প্রোভেক্স-২০০ (প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম) নামক ছত্রাক বারক দ্বারা বীজ শোধন করে লাগাতে হবে।
- প্রতিরোধী জাত যেমন বারি টমেটে-১৬, বারি টমেটে-১৭ চাষ করতে হবে।
- বীজতলার পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে ও পাতলা করে বীজ বুনতে হবে।

কাঠের গুঁড়া পোড়ানো বীজতলা

Publication No. 4 bktl/2018-19

খাদ্য ও পুষ্টিতে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে
নিবেদিত বি-এআরআই

Editorial & Publication
Training & Communication Wing
Bangladesh Agricultural Research Institute
Joydebpur, Gazipur-1701, Bangladesh
Phone: 02 49270038
E-mail: editor.bjar@gmail.com